সংসারমণ্ডলে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছে; পরমাত্মা পরমপিতা বাৎসল্যবশতঃ ভোগের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছেন—ভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বুভুক্ষু জীবাত্মা অপূর্ণকাম বলিয়া—আত্মম্ভরী বলিয়া কেবল আপনিই ভোগ করে; কর্ম্মের ফল—প্রাপ্তব্য উপকরণসম্ভার পরমপিতার মহনীয় চরণপ্রান্তে রাখিয়া বলিতে পারে না, 'দেব! ইহাতে আমার কোনই অধিকার নাই, এ সকলই তোমার, তুমি প্রীত হও, জগৎ প্রীণিত হইবে; তুমি ইহার অধিকারী পরমপিতা, তুষ্ট হও, জগৎ তুষ্ট হইবে; আমি তোমার ভৃত্য, আজ্ঞা পালন করিয়া যাহা করিয়াছি, তুমি প্রভু, তুমি ঈশ্বর, তুমি স্বামী, তুমি তাহার অধীশ্বর, তুমিই তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজা; তোমার ইচ্ছা—তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।' এইরূপ বলিতে পারে না বলিয়াই "পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" 'কর্ম্মফলের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া ভোগ করে।' আর পরমাত্মা পরমপিতা "অনশ্নন্ অভিচাকশীতি।" 'প্রতিগ্রহ না করিয়া বা ভোগ না করিয়া—অর্থাৎ আস্বাদন গ্রহণ না করিয়াই অভিব্যঞ্জিত করেন, প্রত্যুপস্থাপিত করেন—'এ তোমারই ভোগ্য উপকরণ সম্ভার'—যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দেন,—এই সব তোমারই ভোগের উপকরণ সামগ্রী, তুমিই ইহার একমাত্র ভোক্তা, ভোগ কর।'

অহো কি মূঢ়তা! জীবাত্মা হেলায় পরমপিতার একমাত্র আশ্রয়িতব্য চরণকমলের অভিমুখী লোচন যুগলকে টানিয়া লইয়া অসম্বদ্ধ পরিত্যাজ্য ও কষ্টপ্রদ ভোগের উপকরণ সম্ভারের উপরেই স্থাপন করে; স্বর্গ ছাড়িয়া নরকের প্রতিই ভালবাসা জানায়; সুখের উপেক্ষা করিয়া দুঃখকে আহ্বান করে; মঙ্গলে ঘৃণা করিয়া অমঙ্গলকে—আপদ্‌কে—অশান্তিকে আদর জানায়; ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এ স্থানের উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন;—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (২।৪৭)

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার;

"মা ফলেষু কদাচন।" (২।৪৭)

ফলে কখনই নহে। তুমি ভৃত্য, প্রভুর আজ্ঞা পালন কর; কর্ম্ম করিয়া যাও; কর্ম্মের ফল কি হইবে, সে ফল কে ভোগ করিবে, কেন ভোগ করিবে, কিরূপে ভোগ করিবে, তাহা তোমার জানিবার বা শুনিবার আবশ্যক কি? আজ্ঞা পাইয়াছ, পালন কর, এই তোমার কর্ত্তব্য।

"মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" (২।৪৭

কর্ম্মফলের ভোগের কারণ তুমি হইও না; এ কর্ম্মের ভোগ আমি করিব, আমার ইহা হউক—আমি এই করিলাম বা করিতেছি, এ চিন্তা—এ বাসনা বা এ ইচ্ছা তুমি পোষণ করিও না—তাহাই কর্ম্মের ফলভোগের হেতু; কর্ত্তা তুমি হইও না, কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তোমার সাহায্য যতটা আবশ্যক, সে সাহায্যটা তুমি করিও না।

"মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।" (২।৪৭)

তাই বলিয়া যে তুমি কর্ম্ম করিবে না—কর্ম্ম না করায় যে তোমার সঙ্গ—আসক্তি বা ভালবাসা, তাহাও যেন তোমার না হয়। কর্ম্ম না-করিতেও তুমি ভাল বাসিও না। তুমি যোগী হও, কর্ম্ম করিতে হইলে যে কৌশল জানা থাকা চাই, সেই কৌশল জানিয়া কর্ম্মকুশল হও—যোগী—হও।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"
(গীতা) (৬।১)

কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়া, কর্ম্ম-ফলের আশ্রিত না হইয়া—কর্ম্মফলের দাস না হইয়া, যে কার্য্য-কর্ম্ম করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, কে ভোগ করিবে—ইত্যাদির সংবাদ না রাখিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন আজ্ঞা পালন করে, সে সন্ন্যাসীও বটে, যোগীও বটে, অথচ সে অগ্নির পরিত্যাগী নয়, ক্রিয়ায় বিমুখও নয়। সে সন্ন্যাসী কেন ? —না, পরমপিতার চরণকমলেই দৃষ্টি রাখিয়াছে, ফলভোগের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করে নাই, পরমপিতার চরণপ্রান্তে স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনের নিবেদন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছে, কর্ম্মের অধিকার ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, 'এর ফল প্রভো ! তোমার' এই বলিয়া কর্ম্মের ফলও সম্যকরূপে ঈশ্বরচরণে ন্যাস করিয়াছে, সুতরাং সে সন্ন্যাসী। সে যোগী কেন ?—না, কর্ম্ম করিতে কৌশল জানে, কি করিয়া কাজ করিলে, গায়ে তাপ না লাগে, অথচ কাজটিও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইয়া যায়, তাহার ও কৌশল জানে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" গীতা (২।৫০)

কর্ম্মেতে কুশলতাই যোগ, কাজ করিবার কৌশলই যোগ, যে সেই কৌশল জানে, সে যোগী ; সে যে কর্ম্ম না করে, তা' নয় ; করে, অথচ—বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কোন ভেজালেও পড়ে না, কাজ করিয়া দায়ী হয় না, ক্ষতিবৃদ্ধির ধার ধারে না, লাভ-লোক্‌সানের খবরই রাখে না, জয়পরাজয়ের দিক্ দিয়াও যায় না ; কিন্তু সে কর্ম্মী, সে ব্যবসায়ী, এবং সে যোদ্ধা। যে এই উপদেশ মানিয়া চলে, সে ঐ মূঢ়তার পরিচয় দেয় না ; সে এ পরিচয়ও দেয় না যে, পরমপিতার চরণে তা'র আসক্তি কমিয়াছে, তুচ্ছবিষয়ে প্রেম জন্মিয়াছে। সে পরিচয় দেয়—'পরমপিতার চরণপ্রান্তেই বসিয়া আছি, তা'ই ভাল বাসি'—এই মাত্র। সেই ত পিতার নিকট সখ্যভাবে স্থান পায়। সেই ত পরিচয় দেয়—পরমাত্মা ও জীবাত্মা, উভয়ে উভয়ের সখা। সেই ত পরিচয় দেয়—বহ্নিমণ্ডলের সুদীপ্তি ও স্ফুলিঙ্গের আভা সমান—একই ;—উভয়েই সুপর্ণ—সুপক্ষ—অনন্তরশোভন—কেবল বাহিরের শোভা, বা কেবল ভিতরের শোভাই যে আছে, তা' নয়, বাহিরেরও শোভা আছে, ভিতরেরও শোভা আছে। সৈন্ধব যেমন ভিতরে বাহিরে লবণময়, ঐ উভয়ও সেইরূপ ভিতরে বাহিরে শোভন, সৈন্ধবঘনবৎ আনন্দঘন, মঙ্গলঘন, প্রেমঘন—সুপর্ণ। সেই পরিচয় দেয়—ঐ উভয়, উভয় বৃক্ষে আরূঢ় নহে, একই সংসার-বৃক্ষে উভয়েই আরূঢ়, কেবল সমান—একই সংসারবৃক্ষে যে আরূঢ়, তা' নয়, উভয়ে উভয়ের সযুক্—সহযোগী ; পরমাত্মা-প্রাণরূপে জীবাত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, জীবাত্মা জীবিত বলিয়া যাহা কিছু করে, সব প্রাণেই আহুতি করে ; পরমাত্মা এ সকলই সৃষ্টি করিয়া যুবকাত্মার ভোগের জন্য দিয়াছেন, সে সমস্তই যুবকাত্মা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া আবার পরমাত্মার ভোগের জন্য প্রতিদান করে। সে পরিচয় দেয়—

"তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।"
(গীতা ৩।১২)

তাঁহার দেওয়া তাঁহাকে না দিয়া যে ভোগ করে, সেইত চোরই। বাস্তবিকই—'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' এ জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়, সে সমস্তই জগৎপিতার। জগৎপিতা জগদীশ্বর নিজের লীলার জন্যই এ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছেন।

যে তাঁহার জিনিষ, তাঁহাকে না বলিয়া লয়, সে ত চোরই। অতএব চৌর্য্যাপবাদ দূর করিবার জন্য যুবকাত্মার উচিত, যখন সে কোন দ্রব্য গ্রহণ করে বা ভোগ করে, তখন যেন বুঝিয়াই বলে,—'পিতঃ! তোমারি সব, তুমিই সব, এ যা' করিতেছি, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছার সফলতার জন্য।' ইহা দ্বারা দুইটি হয়;—একটি চৌর্য্যাপবাদ দূর, আর একটি নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ। এই হইল—'লোকদ্বয়সাধিনী চতুরতা।' এই চতুরতায় ইহলোক ও পরলোক, এ উভয়ই সাধিত হয়। যে এই চতুরতা জানে না, সে কেবল আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে, পরমপিতার সন্ধানই রাখে না, অথবা সন্ধান রাখিয়াও পরমপিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে ত কুপুত্র; তাহার ইহলোক ও পরলোক, সাধিত হয় না, হয় কেবল পশুজীবন অতিবাহিত করা, আর চৌর্য্যাপবাদের দুর্ব্বিষহ ভার বহন করা, এবং পশুর ন্যায় না জানিয়া শুনিয়া বৃথা জীবন অতিপাত করা। অতএব যুবকাত্মার উচিত চৌর্য্যাপবাদ বহন না করা, মানুষের মত বিবেচনার সহিত পিতার নিকটবর্ত্তী হওয়া, কুপুত্র বলিয়া পরিচিত না হওয়া, সুপুত্র—প্রিয়সন্তান সখা বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

সে যে পরমপিতার সখা, তাঁহারই যুবকসন্তান,—এ পরিচয় দিবে কে? গূঢ় ব্রহ্মবিদ্যাই পরিচয় দিবে, সত্যই আবরণমুক্ত হইয়া প্রকাশ করিবে, 'পিতা পুত্রের সখা, পুত্র পিতার সখা।' সখ্যভাব কার্য্যাভিব্যঙ্গ্য;—কার্য্য দ্বারা সখ্যভাব প্রকাশ করিতে হয়, কথায় নহে; সুতরাং কাজ করিতে হইবে; কাজ করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, 'পিতা আমার সখা।' কাজ না করিয়া মুখে বলিলে, কপটতাই প্রকাশ হয়। এক সময়ে অর্জ্জুন এইরূপ কপটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর পরম সখা পরমপিতা, তাহা তিনি কাজে প্রকাশ না করিয়া কথায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে 'হে যাদব!' 'হে কৃষ্ণ!' 'হে সখে! ইত্যাদিরূপে কথায় সখ্য-ভাব প্রকাশ করিতেন; কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে 'বিশ্বরূপ' দেখাইলেন, যখন অর্জ্জুন পরমপিতার অপার-করুণায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন,—তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, 'পিতাই সব, পিতারই সব,'—গীতা ১১ অধ্যায়।—'হায়! আমি কতই অপরাধ করিয়াছি। পুত্র, পিতার পূজা করিবে কাজে, স্তব করিবে কাজে'—ইহা বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন।

সখার কাছে এইরূপেই মন খুলিয়া বলিতে হয়, প্রাণ খুলিয়া বেদনা প্রকাশ করিতে হয়, হৃদয়ের চিরবদ্ধ কবাটকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেখাইতে হয়। তাহা হইলে, সখাও প্রেমাপ্লুত করে সখার মনঃপ্রাণ ও হৃদয়ের পাপ-তাপ মুছাইয়া পরমানন্দের বীজ রোপিত করেন, করুণার উৎস খুলিয়া করুণরসের উন্মত্তস্রোত তাহার আত্মাতে প্রবাহিত করেন। যুবকসন্তানের প্রাণ শীতল হয়, মন শান্তিময় হয় এবং হৃদয় আনন্দ ও করুণায় ভাসিয়া যায়। এইরূপেই পিতা-পুত্রের সখ্যভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "প্রবাসী" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ "জি-দে-লার্ফোর, গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ গবেষণা পূর্ণ বলিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

(জ্‌-দে-লাফোঁর ফরাসী হইতে)

শত বংসর পূর্ব্বে, আমাদের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য ভূভাগের পরিচয় যাহা কিছু আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা গ্রীক্ ও ল্যাটিন ইতিহাসের খণ্ডাংশ হইতে, এবং কতকগুলি দেশপর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে। প্রমাণের মধ্যে তখন একটি ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্র ছিল :—সেটি বাইব্‌ল্ ; সেই বাইব্‌ল্‌অনুসারে প্রাচীনজাতিদিগের মধ্যে শুধু একটি সভ্য জাতি ছিল :—সে-ই ইহুদি জাতি,—"নির্ব্বাচিত জাতি।" খৃষ্টজন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় ; বিদিত ব্যবস্থাকর্ত্তাদের মধ্যে মুসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখন সে কাল আর নাই—কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, পৃথিবী গঠিত হইতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছিল ; ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন,—লক্ষ বৎসর হইল, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। বহু অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফলে,প্রাচ্য জগৎ এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ; অষ্টাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে সত্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সেই দীপ্যমান সত্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এখন উদিত হইয়াছে। আমাদের যুগের পূর্ব্বে, বিদ্যা-জননী মিসরে ৫০০০ বৎসরব্যাপী সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। কীর্ত্তিস্তম্ভ, পিরামিড, সমাধি-মন্দির, মিসরের ত্রিশটা রাজবংশ—এই সমস্ত, মিসরের ঔপন্যাসিক প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। শঙ্কু-আকৃতি অক্ষরের আবিষ্কার হওয়ায়, চাল্ডিয়া ও অ্যাসিরিয়ারও কতকটা গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জানা গিয়াছে যে, যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে উহাদের সভ্যতা ৪০০০ বৎসরের পুরাতন। চীনসভ্যতার আরম্ভকাল, প্রাগৈতিহাস-কালের মধ্যে এতটা বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, চীনভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা মধ্য-চীন-সাম্রাজ্যের সভ্যতার কাল নির্দ্দেশ করিতে সাহস পান না। পরিশেষে, William Jones, Colebrooke, Burnouf, Lassen, Max Muller, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্য দেশের প্রধান প্রধান পুঁথির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছেন ; কেননা, তুলনা-সিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীক্ জাতি, ল্যাটিন্ জাতি, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতি, সেল্‌ট্-জাতি —ইহারা সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। যে সময়ে মুসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (Exodus), সেই সময়ে ভারতের যে সভ্যতা ছিল, তাহার তুলনা নাই ; দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পিথাগোরাস্, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-ঘট পূর্ণ করিয়াছেন। Fernon বলিয়াছেন, "এসিয়ার চুল্লি হইতেই আলোক বাহির হইয়া আমাদের দেশগুলাকে আলোকিত করিয়াছে।" এবং Panthier তাঁহার "প্রাচ্যখণ্ডের ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর" ভূমিকায় আরও এই কথা বলিয়াছেন :—"সূর্য্যের উদয়কালের সহিত প্রাচী-র যেমন সংস্রব, জগতের সমস্ত শৈশবস্মৃতির সহিত প্রাচ্য দেশের তেমনি সংস্রব। প্রাচ্য ভূমির সৈকত-সমুদ্রে কত কত জাতি শয়ান ; এই প্রাচ্য ভূমি চিরকালই বর্ত্তমান। প্রাচ্যখণ্ড এখনও তাহার বক্ষের উপর মানব-জাতির প্রথম প্রহেলিকা ও আদিম স্মৃতিগুলি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি দার্শনিক তত্ত্ব— সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব আমাদের নিজেকে জানিতে হইলে, উহাকে জানিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক।"

আমাদের সভ্যতার জন্য আমরা প্রাচ্যখণ্ডের নিকট ঋণী। শিল্পকলার মধ্যে যদি চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী আর সমস্ত শিল্পকলা আমরা প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছি মাত্র। দর্শন কিংবা ধর্ম্মঘটিত যে সকল তত্ত্ব এখন আমরা আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানি, তাহাদের মধ্যে এমন একটি তত্ত্বও নাই, যাহার মূলসূত্র প্রাচীন জাতিরা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাস্তুবিদ্যার কথা যদি বল, —তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ কীর্ত্তিমন্দিরের চাপে আমরা নিষ্পেষিত বলিলেও হয়। সে সময় তাহাদের সভ্যতা আমাদেরই মত উন্নতি লাভ করিয়াছিল ; তা'ছাড়া, কোন কোন প্রাচীন জাতির আচার-ব্যবহারের মধ্যে যে একটি মাধুর্য্য দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধে আমরা আর অহঙ্কার করিতে পারি না।

Bournouf-এর কথা-অনুসারে, ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের অসাধারণ সভ্যতার শুধু একটা প্রমাণের আমরা উল্লেখ করিব। সে কথাটি সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য-সাধারণ। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে এমন কতকগুলি নাটক ছিল, যাহা একেবারেই দার্শনিক ; তাহার পাত্রগণ কতকগুলি মানসিক ভাব মাত্র। তাহার একটি দৃষ্টান্ত :—"প্রবোধ চন্দ্রোদয়।" Bournouf উপসংহারে এই কথা বলিয়াছেন :—ইহা হইতে অনুমান করা যায়, ভারতীয় নাটকের এরূপ শ্রোতৃমণ্ডলী ছিল, যাহা—কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোন নাট্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর একটা ব্যাপার,—হিন্দুজাতির মধুর প্রকৃতি ও উচ্চ জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মেগাস্থিনিস্ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত

দুই পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে, হিন্দু-কৃষক শান্তভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে দেখিয়া গ্রীকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি বলেন,—"কৃষকের শরীর পবিত্র, কৃষক অবধ্য,—কেননা, কৃষক শত্রু-মিত্র উভয়েরই হিতকারী।"

১৪০০ বৎসরের পুরাতন—বাইবেলের 'পুরাতন বিধান গ্রন্থ ;' খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান আচার্য্যেরা নব-বিধান গ্রন্থের সহিত পুরাতন-গ্রন্থটি জুড়িয়া দিয়া একটা ভারী ভুল করিয়াছেন ;—খৃষ্টধর্ম্মের উপর একটা দুঃসহ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহার ফলে, পরম্পরাক্রমে অনেকগুলি ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে ; সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলী ইহা স্বীকার করেন। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল মুখ্য ভ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, ইহুদি জাতিই নির্ব্বাচিত জাতি—ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত।

নির্ব্বাচিত জাতি কেন ?—খৃষ্টীয় আচার্য্যেরা বলেন, যে হেতু, পুরাকালে শুধু ইহুদিজাতিই একেশ্বরবাদী ছিল, ইহুদিরাই এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকে জানিত।

এরূপ অভিমানের কথা আজিকার দিনে আর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মিসর, চাল্‌ডিয়া ও বাবিলনের পুরোহিতেরা, তাঁহাদের দীক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের একত্বসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেদ, মানবধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ, পারসিকদিগের আবিস্তা—এই সমস্ত হইতে পর্য্যাপ্তরূপে সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দু ও পারসিকেরা পরব্রহ্মের একত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিত।

অ্যারিস্‌টটেল তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—"যে সকল উপদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহা পুরাণের আকারে ভবিষ্যদ্‌ বংশের নিকট উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বরই জগতের সর্ব্বাদিম মূলতত্ত্ব এবং ঈশ্বরেরই শক্তি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, ইতর-সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ও সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, গল্পচ্ছলে সংযোজিত হইয়াছে।"

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, সমস্ত পুরাকালে, ধর্ম্মের গুহ্য মত কেবল অল্পসংখ্যক দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই ব্যক্ত করা হইত ; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই, ধর্ম্মের গুহ্যাংশ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তির জন্য ও ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ সাধারণ লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এমন কি, প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেণ্ট-পিটার ও সেণ্ট-পাউলের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয় : সেণ্টপাউল গুহ্যধর্ম্ম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেণ্টপিটার তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হয়। আরও বহুকাল পরে, বিশপ Synesius এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন :—"জনসাধারণ নিতান্তই চাহে যে, তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা হয়। তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা ছাড়া আর উপায় নাই। মিসরের পুরাতন পুরোহিতেরা এইরূপ ব্যবহারই করিত ; লোক ভুলাইবার জন্যই তাহারা দেবালয়ের মধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং সেই খানে থাকিয়া লোকের অগোচরে গুহ্য ব্যাপার সকল প্রস্তুত করিত। এ কথা লোকেরা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই রুষ্ট হইত। তাই, সাধারণ লোকের সহিত সাধারণ লোকের মতই ব্যবহার করিতে হয়। আমি নিজে চিরকাল তত্ত্বজ্ঞানীর মতই থাকিব ; কিন্তু লোকের নিকট আমি কেবলই পুরোহিত।"

পুরাতন মিসরের লোকেরা যে কেবল জীব-জন্তুরই উপাসক ছিল, এই অসঙ্গত কাহিনীটা নিতান্তই অমূলক, সন্দেহ নাই। ইহুদি জাতিকে যে ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি বলা হয়, আমরা দেখাইব, ইহুদি জাতি সে সম্মানের যোগ্য নহে। যে ঈশ্বরের জন্য ইহুদি জাতি এত গর্ব্বিত, সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ ছিল ? তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের ভাবে দেখিত ; তাহাদের ঈশ্বরের কল্পনা মানবসাদৃশ্যমূলক কল্পনা ; ইহুদিদের ঈশ্বর শরীরী ঈশ্বর। সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, ঈশ্বর মানুষকে নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ সৃষ্টি করেন ; ঈশ্বর পার্থিব স্বর্গে বিচরণ করেন ; তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন, তিনি অনুতাপ করেন, বিস্মৃত হয়েন, তিনি স্মরণ করেন। মূসার বহির্যাত্রার (Exodas) প্রকরণে, ঈশ্বর, নিয়মাবলী স্বহস্তে লিখিয়াছেন। কি প্রস্তর খোদিত করিয়া, কি চিত্র কর্ম্মের দ্বারা, তাঁহার মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। এই ঈশ্বর—উচ্ছেদকারী-ঈশ্বর—যিনি পিতা মাতার অপরাধের জন্য, তাহাদের সন্তানের উপর তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিশোধ লয়েন, এই ঈশ্বর ইহুদি জাতিরই ঈশ্বর, অন্য জাতির ঈশ্বর নহেন ; এবং যখন তিনি ইহুদি জাতির প্রতি রুষ্ট হইলেন, মূসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমাকে নিরস্ত করিও না, আমার প্রজ্জলিত রোষানল ইহুদিজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলুক।" এইত ইহুদিদিগের একেশ্বরবাদের ধারণা ; তা'ছাড়া একেশ্বরবাদের ধারণাকে তাহারা বজায় রাখিতে পারে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা বিদেশী দেবতাদের নিকট বলি দিত, ইহুদিদিগের ভবিষ্যদ্বক্তারা ও ইহুদিদিগের ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইহুদিদের "মাথাগুলা নিরেট।" ইহুদি জাতি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভাব এতই কম বুঝিত যে, ওলড্‌টেষ্টেমেণ্ট খুঁজিয়া আত্মার

অমরত্বসম্বন্ধে একটি কথাও পাওয়া যায় না; সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহুদিদের ইতিহাস,—চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, খুন, লোকহত্যা, আরও অন্যান্য জঘন্য আচরণের সুদীর্ঘ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক্ষণে ইহুদি জাতির ঈশ্বরের ধারণার সহিত, আর্য্যজাতির ঈশ্বরের ধারণার তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে ব্রহ্ম, ক্লীব্‌লিঙ্গ, নামহীন, মনের অগম্য, ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। মনুর লক্ষণানুসারে,—"যিনি স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য, নিত্য, বিশ্বের অন্তরাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।" তিনিই পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, উপাধিহীন, নির্ব্বিশেষ। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন, জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তিনি ব্রহ্মা নামের বাচ্য হইলেন; পুংলিঙ্গবাচক এই ব্রহ্মা সৃজনশক্তিরূপে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত।

পারস্যদেশীয় আর্য্যদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে এই একইরূপ ধারণা :—Zervane—Ackerne ইনিও নিষ্ক্রিয়, শান্ত; আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতেই শুভ ও অশুভের মূলতত্ত্ব—অর্মজ্‌দ্ ও আহরিমান নিঃসৃত হইয়াছে। পারসিকদিগের দ্বৈতবাদসম্বন্ধে যে ভ্রম সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই ভ্রমটি প্রসঙ্গক্রমে এই খানে সংশোধন করিয়া দিই। জের্ব্বান—আক্কেরেণ এক অদ্বিতীয় বস্তু; কিন্তু অর্মজ্‌দ্ আহরিমান এই দুই প্রতিদ্বন্দী তত্ত্ব, যমজ হইলেও সমান নহে। ফলতঃ মঙ্গলের মূলতত্ত্ব অর্মজ্‌দ্ প্রথমে জন্মগ্রহণ করে; অর্মজ্‌দ্ আহরিমান অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্ এবং কল্পকালের অন্তে, আহরিমান একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। আর গ্রীক্ আর্য্যদের কথা যদি বল, সকলেই জানে,—পিথাগোরাস, সক্রেটিস্ ও প্লেটো, পরমেশ্বরের একত্ব অবগত ছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে উপদেশও দিতেন। প্লেটো ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন; অ্যারিষ্টটেল্ বলিয়াছেন, "তিনি সেই চিৎ – যাহা আপনাকে আপনি চিন্তা করে।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্য্যদিগের অতীন্দ্রিয় ধারণা ও ইহুদিদিগের মানবিক ধারণা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উহার মধ্যে একটি যেমন উন্নত ও দার্শনিক, অন্যটি তেমনি স্থূল ও সীমাবদ্ধ।

ভারত প্রভৃতির যখন উন্নত অবস্থা, তখন ইহুদি জাতির অস্তিত্বই ছিল না, এমন কি, উহারা প্রাচীন গ্রীক্‌দিগেরও পরে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের এই স্পর্দ্ধাবাক্যের ভিত্তি কি?—না, উহারাই কেবল ঈশ্বরকে জানিত। আর সে ঈশ্বর কিরূপ ঈশ্বর?—তিনি মহাশক্তিমান্ ঈর্ষ্যাপরায়ণ ঈশ্বর, সৈন্যসামন্তের ঈশ্বর, সর্ব্বোচ্ছেদক, যথেচ্ছাচারী, বৈরনির্য্যাতক, নিষ্ঠুর ঈশ্বর; মিসরে মহামারী আনয়ন করিবার উদ্দেশেই এই ঈশ্বর "ফ্যারাও"র হৃদয়কে পাষাণকঠিন করিয়া দিয়াছিলেন; মনুষ্যের কোন এক বংশকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনুতাপ হইল এবং সেই বংশকে তিনি প্রলয়বন্যায় ডুবাইয়া মারিলেন। এখন খৃষ্টানেরা তাঁহাদের মধুর-প্রকৃতি মহাপুরুষ যিশু-খৃষ্টকে এই ঈশ্বরেরই পুত্র বলিয়া কি স্বীকার করিতে পারেন? হায়! অষ্টাদশশতাব্দীকালব্যাপী অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে কত ভ্রমই বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে! কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে; বিজ্ঞান, খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় জটিলতার নিরাকরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আর্য্যজাতির মতবাদের কিয়দংশ, খৃষ্টধর্ম্ম আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে এবং অল্প অংশই সেমিটিক জাতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা প্রাচীনকালের আর্য্যধারণার অনেকটা কাছাকাছি; সেই ঈশ্বর বিশ্বের ঈশ্বর, তিনি শুদ্ধাত্মা ও পরিপূর্ণ। এবং খৃষ্টবাদ ও আর্য্যমতবাদ উহা সেমিটিক্ মতবাদ নহে।

অবতারবাদও আর্য্যমতবাদ—উহা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ায়, Hypostases নামে এই মতবাদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। এই মতবাদ হইতেই "একে তিন, তিনে এক" এই ত্রিত্ববাদের জন্ম হইয়াছে। বাইবেলের পূর্ব্বভাগে, এরূপ কোন মতবাদই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহুদিধর্ম্মের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই। তা'ছাড়া, Burnouf তাঁহার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান" গ্রন্থে কি বলেন শোনো :—"খৃষ্টানদের সমস্ত দার্শনিক মতবাদই জেন্দাবেস্তার মধ্যে আছে :—যথা, এক ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, অন্তরাত্মা ঈশ্বর, ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, পিতৃজাত পুত্র, শরীরের প্রাণ ও আত্মার পাবন। পতনবাদ, উদ্ধারবাদ, আরম্ভে ঈশ্বরের সহিত অসীম আত্মার সমবায়, যে অবতারবাদ ভারতে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেই অবতারবাদের কিঞ্চিৎ আভাস, ধর্ম্মসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, Amschaspand ও Darvend নামক শুভ ও অশুভ দেবদূত, আমাদের অন্তরে যে ঈশ্বরের বাণী অবস্থিত, সেই বাণীর প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুক্তির আবশ্যকতা—এই সমস্ত কথাও উহার মধ্যে পাওয়া যায়। আবেস্তা-ধর্ম্মে পশুবলি নাই। ইহুদিরাও খৃষ্টীয় পুনরুত্থান উৎসবে মেষ-বলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে মানসিক বলি প্রবর্ত্তিত করে। মতবাদ ছাড়িয়া, যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠান, সাংকেতিক চিহ্ন, ও ধর্ম্মভোজ আদির (sacrament) কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে

পাওয়া যাইবে, ইহুদি ধর্ম অপেক্ষা আর্য্য ধর্মাদি হইতেই উহার অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে :—যথা অগ্নি ও সুরা-পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন, ক্রুসের চিহ্ন, খৃষ্টের পুনরুত্থান উৎসবে ব্যবহার্য্য মোম-বাতি, কোন কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তৈল,—এই সমস্ত বৈদিক ধর্মের সামগ্রী। অবগাহন-সংস্কার (baptism), দোষস্বীকার-প্রথা, আচার্য্য-নিয়োগ-অনুষ্ঠান, মস্তকমুণ্ডন—এ সমস্ত ব্রাহ্মণিক ধর্ম হইতে গৃহীত। সকল আর্য্য-ধর্মের মধ্যেই বিবাহ সংস্কার প্রচলিত ছিল। পুরোহিতদিগের চিরব্রহ্মচর্য্য, দোষস্বীকার, অনুতাপ,—এই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মঠ, সঙ্ঘ, ধর্মপ্রচার—এই সমস্ত জন্য খৃষ্ট-মণ্ডলী বৌদ্ধধর্মের নিকট ঋণী।

Saint Basile বৌদ্ধ মঠের আদর্শে তাঁহার বৃহৎ ধর্মসমাজ গঠিত করিয়াছিলেন।

আর সন্ন্যাসী-তপস্বী-সম্প্রদায়ের কথা যদি বল, যিশুখৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণিক ভারতে ছিল।

ক্যাথলিক পাদ্রিদের মধ্যে পুরোহিত-শ্রেণীর যে সোপানপরম্পরা আছে, তাহার অবিকল আদর্শ বৌদ্ধ-তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ডালাই-লামা আছে,—লামাদের সভায় সেই ডালাই-লামা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই লামারা তাহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে, ক্রুস ধারণ ও "metre" টুপি, শাদা আলখাল্লা প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকে। চীনের ক্যাথলিক পাদ্রি father Bury চীনের পুরোহিতদিগকে, ক্যাথলিক পাদ্রির মত মুণ্ডিত-মস্তক দেখিয়া, ও জপমালা ব্যবহার করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—"আমাদের মধ্যে এমন একটিও পরিচ্ছদ নাই, পৌরোহিতিক কর্ম নাই, ক্যাথলিক ধর্মের অনুষ্ঠান নাই,—সয়তান যাহার নকল এ দেশে করে নাই।" "গৌতম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক গ্রন্থে Gerson da Cunha আরও এই কথা বলেন :—"এই সম্প্রদায় (যাহারা "মহা-যান"-মতাবলম্বী), অনেক বিষয়ে রোমানক্যাথলিকদিগের সহিত উহাদের মিল দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মঠ আছে, শুধু তাহা নহে, ধর্মপদবীতে উন্নত ভিক্ষুশ্রেণী আছে, মস্তকমুণ্ডনপ্রথা, চিরব্রহ্মচর্য্য ও স্মারকচিহ্নের পূজা ও পাপস্বীকার পদ্ধতিও উহাদের মধ্যে আছে। উহাদের মোচ্ছব আছে, সমবেত উৎসব-যাত্রা আছে, প্রার্থনা-সংহিতা আছে, ঘণ্টা আছে, জপমালা আছে, শান্তিজল আছে এবং উহারা সিদ্ধমহাপুরুষদের মধ্যবর্ত্তিতায় বিশ্বাস করে।" উৎপত্তির হিসাবে ইহুদিধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্মসমূহের সহিত খৃষ্টধর্মের যে অধিক যোগ, তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সেমিটিক ধর্মসমূহের সহিত ইহুদিধর্মের একটা তুলনাত্মক সমালোচনা করিলেই ইহুদিধর্মের উৎপত্তি এবং ইহুদিধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। আসীরীয়-দিগের ঈশ্বর যেমন জিহোবা, মুসলমানদের ঈশ্বর যেরূপ আল্লা, ইহুদিদের ঈশ্বর সেইরূপ জিহোবা। সমস্ত সেমিটিকজাতির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা একই প্রকার—ইলু (যাহা হইতে এলোহিম, আল্লা, এল উৎপন্ন) যাহার অর্থ মহাশক্তিমান্,—কি পুরাতন কি আধুনিক, সমস্ত সেমিটিক জাতির ঈশ্বর এই নামেই পরিচিত—এই ঈশ্বর আদেশ-প্রচারক প্রভু; আসীরীয়দিগের মধ্যে ইনিই অসুর, এবং দেশের রাজা ইঁহারই মন্ত্রী; ইহুদিগের মধ্যে ইনিই জিহোবা এবং মুসাই তাঁহার প্রবক্তা; মুসলমানদের মধ্যে ইনিই আল্লা, এবং মহম্মদই আল্লার "নবা" বা প্রবক্তা।

অসুর, জিহোবা ও আল্লা, বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; নরহত্যার দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রচারিত হয়, এবং তলোয়ারই তাঁহাদের সাংকেতিক চিহ্ন ছিল। তাঁহাদের লইয়া যে যুদ্ধ, তাহা দিগ্‌বিজয়ের যুদ্ধ—ধর্ম প্রচারের যুদ্ধ; এইস্থলে দিগ্‌বিজয় ও ধর্মপ্রচারের মধ্যে একটা ছুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। "লেশমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবে না"—ইহাই তাঁহাদের বাজমন্ত্র ছিল। এই সকল ঈশ্বর বিশ্বজনীন ঈশ্বর হইতে পারে নাই; অসুর, চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; জিহোবার উপাসকেরা পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে মুসলমান ধর্ম কত কত সভ্যতার ভগ্নাবশেষের উপর স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারও প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছে। মধ্যযুগে যে ইস্‌লাম-ধর্ম য়ুরোপের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই ধর্ম আজ পরাভূত হইয়াছে। কি স্পেন, কি আফ্রিকা, কি ইজিপ্ট, কি তুর্কি, কি ভারতবর্ষ—এই সমস্ত দেশের আর্য্যদের নিকট ঐ ধর্ম হটিয়া গিয়াছে। এইরূপ রোমকগণকর্তৃক ইহুদিরা ও আর্য্য-পারসিকগণ কর্তৃক আসীরীয়েরা বহিস্কৃত হইয়াছে।—

ইহুদিজাতি হইতে খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি হয় নাই। উহাদের সভ্যতা অতীব সীমাবদ্ধ; মিশর দেশ হইতে বাহির হইবার সময়, মিশর দেশ হইতে এবং যে ব্যাবিলোনিয়া ও পারস্যদেশ উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল,—ঐ দুই দেশ হইতেও উহারা কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হয়।

উহারা পশ্চাৎশিরস্ক (Occipital) জাতি,—অর্থাৎ ঐ সকল জাতির মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ, পুরোভাগ অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট। উহাদের দৈহিক বৃদ্ধির দ্রুততা প্রযুক্ত মাথার খুলির অস্থিগুলা, ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই, পরস্পর

য়ের সহিত দৃঢ়রূপে যোড়া লাগিয়া যায়; সুতরাং মস্তিকের ধূসর অংশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আর্য্যজাতীয় লোকের করোটীর (মাথার খুলী) অস্থিখণ্ডগুলা বেশী বয়সে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণরূপে যোড়া লাগে এবং এই কারণে উহাদের সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয় না। এই দেহতাত্ত্বিক প্রভেদপ্রযুক্ত, কোন সেমিটিক জাতির পক্ষে, কোন প্রকার সমুন্নত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

বিভিন্ন সভ্যতা, একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়; প্রত্যেক সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি গ্রহণ করিয়া, তাহার নিজের বিশেষ প্রতিভার দ্বারা আবার তাহা হইতে নূতন পরিণাম-পরম্পরা উৎপাদন করে। অতএব, এইরূপ সহসা মনে হইতে পারে যে, প্রাচীনসভ্যতা সমূহের উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্য প্রাচীনসভ্যতাসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না। কোন জাতির শ্রেষ্ঠতা তিন জিনিসের উপর নির্ভর করে—দর্শন, ধর্ম্মনীতি, ও শিল্পকলা। বৈষয়িক সভ্যতা, জ্ঞানধর্ম্মের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্পিনোজা, লাইব্নিজ, কাণ্ট, দেকার্ত্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফিক্তে, স্পেন্সার, শপেন্হোয়র পর্য্যন্ত, আমাদের মধ্যে এমন একটিও দর্শনতন্ত্র নাই, যাহা আমাদের নিজস্ব রত্নখনি হইতে উৎপন্ন; আমরাও এখনও গ্রীক্ দর্শনসম্প্রদায়ের দর্শনাদির অনুশীলন করিয়া থাকি; আবার এই গ্রীকেরা তাহাদের দার্শনিকতত্ত্বসকল গোড়ায় মিসরদেশীয় পুরোহিত ও ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আসিয়া, অ্যালেকজাণ্ড্রীয়সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; এবং সমস্ত পাশ্চাত্যখণ্ড সেই ভাণ্ডার হইতে আপন আপন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। Saint Jerome, Magnusকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এইরূপ আছে:—"খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যদের কথা আর কি বলিব, যে প্রাচীনদিগের মত তাঁহারা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত, সেই প্রাচীনদিগের অন্নেই তাঁহারা পরিপুষ্ট।"—যত কিছু উন্নত নীতি-উপদেশ, তাহা ভারত ও চীন হইতেই আসিয়াছে। পীত-জাতির মধ্যে আবার এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, উহারা ঈশ্বরের কল্পনা বর্জ্জন করিয়া, শুধু ধর্ম্মনীতির ভিত্তির উপর, উহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। আমার প্রণীত "মনু ও ভগবদ্গীতা" গ্রন্থে আমি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে ব্রাহ্মণিক ভারতের অতীব উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই মধুর-প্রকৃতি শাক্যমুনির এই সকল নীতি সূত্র—যথা "কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে ক্ষমা করিবে"; "ক্ষুদ্রতম জীবকেও হিংসা করিবে না" "দরিদ্র ও ধনীকে সমভাবে দেখিবে"—এই সকল উপদেশ বাক্য অতিবড় নিষ্ঠুর জাতিদিগকেও সভ্য করিয়া তুলিতে,—কোমল ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এ কথা সত্য, অবনতিগ্রস্ত ভারত, পারস্য, গ্রীস ও রোমের চিত্র, যাহা আমাদের সম্মুখে এখন রহিয়াছে, তাহা বড় একটা গৌরবজনক নহে; কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি না, আমাদের সভ্যতার চিত্র উহাদের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, পাষণ্ড-দলনী বিচার-সভা, (Inquisition) দাসত্বপ্রথা—এই সমস্ত পাশ্চাত্যসভ্যতার রক্তময় কলঙ্ক; আরও কাছাকাছি সময়ের কথা যদি ধর,—৮৯র রাষ্ট্রবিপ্লব—স্বাধীনতা ও ন্যায়ের যুগ উদ্ঘাটন করা যাহার উদ্দেশ্য ছিল—সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের রক্তাপ্লুত আতিশয্য ও অত্যাচার, বুদ্ধদেবের শান্তিময় বিপ্লবের কথা মনে করাইয়া আমাদের চিত্তকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে।

লোকে যাহার এত নিন্দা করে, সেই হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা ও আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র,—উহাদের অপব্যবহার সত্ত্বেও,—সভ্যতাকে যে অনেক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তা'ছাড়া, যে অবিনশ্বর মূলতত্ত্বগুলির উপর বর্ণভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত, সেই বর্ণভেদপ্রথা কি য়ুরোপেও আজিকার দিনে রহিত হইয়াছে? রহিত যে হয় নাই, তাহার সাক্ষী—য়ুরোপের সোশ্যালিষ্ট ও অ্যানার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের আন্দোলন। বর্ণভেদপ্রথা যে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু যে মূলতত্ত্ব হইতে বর্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি, সেই মূলতত্ত্বটি নিজে ন্যায়ানুমোদিত এবং তাহার পরিণামও মহৎ ও বহুফলপ্রসূ। সভ্যতা-সমূহের পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু মানুষ সেই মানুষই থাকিয়া যায়। শব্দের পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রাহ্মণিক ভারতে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু হইলেও, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী; ঊনবিংশশতাব্দীর য়ুরোপে, ধনীরাই প্রভু,—পণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীও নহে। "ক্ষাত্র ধর্ম্ম—" আজিকার দিনে সৈনিকতার (militarism) এক শেষ; অসির শাসনতন্ত্র, ন্যায় ধর্ম্মের উপর বলের প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বৈশ্যের স্থান বড় বড় কারখানাওয়ালারা অধিকার করিয়া, তাহাদের মূলধনের চাপে ক্ষুদ্র বণিকদিগকে নিষ্পেষিত করিতেছে। এখনকার শূদ্র—শ্রমজীবী, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া, উত্থান করিয়াছে ও Socialism-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনকার চণ্ডাল, পারিয়া,—সেই দরিদ্রগণ, যাহারা ন্যায়বিচারে পায়

না, সেই আইরিশ লোক,—নিজ ভিটা-ভূমির উপর যাহাদের কোন অধিকার নাই—যাহারা একপ্রকার রাষ্ট্রিক মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে, যাহারা তপ্ত-লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া দাগী গোলাম! মনুর সমস্ত নীতি-উপদেশ অনুসারে, নিক্রিয় ওজনে কার্য্য হইত না সত্য; কিন্তু একথাও নিশ্চিত, যে জাতি ওরূপ উচ্চরাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধার্ম্মিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে তাহাদের সেই কল্পনাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার সাক্ষ্য দিতেছে। কোন্ রাজা কিংবা কোন্ পার্লেমেণ্ট আজিকার দিনে ব্যবস্থাসংস্কারের নেতৃত্ব সাহসপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে?—জুয়া খেলা ও কপাল-ঠোকা বাজির খেলা নির্ভীকভাবে নিষেধ করিতে পারে? মনু কিন্তু তাহা করিয়াছেন। আমাদের ব্যবহার-চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িয়াছে; কাঞ্চনের প্রলোভনে আমাদের রাষ্ট্রশাসক লোকেরা, আমাদের লেখকেরা আমাদের শিল্পীরা, আমাদের পাদ্রিরা, আমাদের অভিজাত বর্গ, নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখন বাকী রহিল শিল্পকলা; এবিষয়ে একটু তারতম্যের বিশেষত্ব আছে। পুরাকালে, বাস্তশিল্প বিষয়ে,—মিসর, আসীরিয়া, ও গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান আসন ছিল, এখনও উহাদের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ছুঁচাল খিলানের শিল্প ছাড়া, পাশ্চাত্য-খণ্ড, এই বিষয়ে কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, কেবলই দাসবৎ নকল করিয়াছে। ভাস্করকর্ম্মে গ্রীকেরা চিরকালই আমাদের শিক্ষাগুরু; গ্রীকদের ও এট্রুরিয়া-বাসীদের মৃণ্ময় পাত্রাদি আমাদের নিকট বিশেষ প্রশংসার জিনিস। তবে, আমাদের শ্রেষ্ঠতা (ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে) সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উন্নতিসাধনে; কেবল এই বিষয়েই নিজত্ব ও নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়া আমারা পুরাতনজগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধার সহিত উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ইহাই তুলনাসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত চিত্র। অবশ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান-রাজ্যের বড় বড় আধুনিক আবিষ্কার সকল, আমাদের প্রধান সম্বল ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু আসলে উহাদের মূল কোথায়? ন্যায়তঃ যাহার যে প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত; অতএব প্রাচ্যখণ্ডকে ভাল করিয়া বুঝিলে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, প্রাচ্য খণ্ডই সেই সূর্য্য. যেখান হইতে আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কুলপতির ন্যায় প্রাচ্য-ভূমিকে আমাদের ভক্তি করা উচিত, যেহেতু আমরা তাঁহারই বংশধর। একথাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই, যে সময়ে আমরা পশুচর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া, য়ুরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্যে, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই সময়ে প্রাচ্যখণ্ড, সভ্যতার দীপ্ত-আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI)

God's Omnipresence.

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কং
দ্বৌসন্নিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ
উতেয়ং ভূমি র্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌদ্যৌ বৃহতী দূরে অন্ত
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।

অথর্ব্ববেদ ৪কা: ৭প্র:।

Whoso moves, stands or rests, whoso seeks a hiding place in dark cells and lonely caves, King *Varuna* knows it all. If two sit together and scheme, King *Varuna* is there as the third and perceives it also—রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ। Nothing lies hidden, none can remain concealed from Him. Whosoever hide in dark recess or lurks in secret cell, *Varuna* detects him and spies his movements. If any two men should hold good or evil counsel among themselves, the King is there, a third, and sees it all. Realizing God's perpetual presence in your midst, fear to commit sin and zealously devote yourselves to the performance of good works. Remember that the Father and Mother of us all, is always with us, watching all our movements. No sin that we commit can ever remain hidden from Him. Let His presence deter you from evil deeds and His loving and encouraging eyes impel you to deeds of righteousness. When we do good, His benign countenance is revealed unto us and the fierceness of His wrath alights upon our evil actions. He knows when we are doing wrong and when we are walking in righteousness and metes out his rewards and punishments according to our deserts.

Ekohamasmityatmanam yattwam kalyana manyase – Friend, thou thinkest thou art alone, but it is not so.

Nityamsthitaste hridyesha punya papekshita Munih That all-seeing witness sitteth enthroned in thy heart, looking on at thy good and evil deeds.

This idea is clearly expressed in our Text of the *Atharvaveda.* Whoever moves or stands or rests, who seeks a hiding place in caves and cells, *Varuna* knows it all. Where two persons are closetted together in secret council, He is there a third. He is the fourth amongst three, the fifth among four, the

sixth among five. If a hundred people are here gathered together, then you must add one more to the number so as to include Him.

Who is this king *Varuna* ? He is described in the following *Mantra*: ইয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞঃ: This boundless Earth is king *Varuna*'s. He is the Ruler of the whole universe. How strange it is that men should deem themselves kings by holding sway over petty kingdoms of this Earth. How baseless is their pride ! How empty their title ! *Varuna* is the real king not of this Earth only but also of yonder vast sky, whose bounds are far away. The two oceans of air and water find a place within his body and are supported by Him. He is not only in the deep sea but in this petty drop of water is he also hidden—অস্মিন্নুদকে নিলীনঃ।

He who is the Ruler of Heaven and Earth, who permeates all things, great and small, He is the God of our worship. He whos is king of the whole Earth and the Infinite heavens, He who is immanent in the oceans of air and water, smaller than small, greater than great, who is in the endless sky as also in this tiny drop of water, He is the God of our worship. He who is with us always, who encourages and rewards all righteous deeds, who when we succumb to sin delivers us from evil after punishing our transgressions, He is the God of our worship.

Long ages ago our *Rishis* in this *Atharva Veda* gave utterance to truths to which we still give the assent of our whole heart and which arouse feelings of the deepest reverence. In this *Mantra* of *Atharvaveda* how clearly we perceive God as the universal witness. The ancient *Rishis* have given expression to those thoughts that are nearest to our hearts. Truth is by no means confined to any particular period in the world's history but reveals itself at all times. As sparks fly out of the fire, as rays of light radiate from the sun, so Truth ever flows from God, its fountainhead. Holy and devout men cannot fail to attain spiritual truths, whenever, by piety and purity of character, they prepare the ground for their reception. Truth flows from God without ceasing, but alas ! few are the men fit to receive it.

What a blessing it is for us, born as we are in this unfortunate land, that we are able to worship the true God, the Infinite Brahman. What a blessing it is that we should come here to worship Him who is the ruler of the whole universe, Lord of men and *Devas*, to worship Him and be sanctified by His holy presence. This is indeed a blessed hour, a supreme moment of holy communion (*Brahmamuhurta*) As, seated in the heart of the sun, He illumines the whole world by its rays, in the same way, dwelling within our souls, He inspires our understanding and strengthens our conscience. With Him, our worshipful ? Lord, we are united in bonds of eternal fellowship. Brethern, let us fulfil our life's mission by worshipping Him together with love and reverence.

নানা কথা।

উপাধি লাভ। 'সুপ্রভাত'—সম্পাদিকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, কাশী পণ্ডিত-সমাজ হইতে 'সরস্বতী' উপাধিতে বিভূষিতা হইয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত জয়রাম বেদান্তবাগীশ উপাধিদাতাগণের মধ্যে অন্যতম। কুমুদিনীর পিতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী ব্রাহ্ম ও সুপ্রসিদ্ধ সঞ্জীবনী সম্পাদক। মাতৃকুলে ইনি আমাদেরই ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী। ইহাঁতে পিতৃমাতৃ উভয় কুলই ধন্য হইয়াছেন। ইনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় ও স্বদেশসেবায় আরও যশস্বিনী হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভজনালয়ের উপাসকের প্রতি দশটি আজ্ঞা।

১। যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভজনালয়ে উপস্থিত হইবে। ২। ভজনালয়ে (বেদীর) সম্মুখস্থ আসন অধিকার করিবে। ৩। প্রতি উপাসনার দিনে অন্ততঃ তিনজন অপরিচিত লোকের সহিত সখ্য-স্থাপন করিবে। ৪। প্রতিবেশীকে স্নেহ ভক্তি করিবে, তাহাদিগকে ভজনালয়ে আনিবার চেষ্টা করিবে; তাহাদের প্রতি তোমার ভালবাসার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়। ৫। আপনাকে ভজনালয়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ বলিয়া বিবেচনা করিবে, এ ভাব মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিবে যে তোমার অভাবে ভজনালয় যেন সত্য সত্যই বিনাশোন্মুখ। ৬। উপাসনার দিনে উপস্থিত থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবে। ৭। সর্ব্ববিধ মতভেদ বিবাদ বিসম্বাদের ভাব বাহিরে রাখিয়া ভজনালয়ে প্রবেশ করিবে এবং আপনাকে ঈশ্বরের পুণ্য পরিবারভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৮। উপাসকের কর্ত্তব্য সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলেই অপরের ত্রুটি বিচার করি-

যার তোমার অধিকার আছে, ইহা স্মরণে রাখিবে। ৯। উপাসনা দিনে উপাসকগণের মধ্যে আপনাকে অগ্রণী বলিয়া মনে করিবে। ১০। এইভাবে জীবন কাটাইবে যাহাতে তোমার জীবন দেখিয়াই লোকে তোমার ভজনালয়ের সমুচ্চ ভাব বুঝিতে পারে। The Christian life, 22nd august.

মোগল বাদশাহের দৈনিক জীবন। বাদশাহ সাজাহান প্রতিদিন প্রত্যূষে ৪ টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া বেশবিন্যাসান্তে প্রার্থনা ও কোরাণ পাঠ করিতেন। প্রাতে ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ দর্শন-বাতায়ন হইতে প্রজাবর্গকে দেখা দিতেন। প্রজারা যমুনাতীরভূমিতে থাকিয়া দুর্গের তলদেশ হইতে আবেদন পত্র প্রদান করিত এবং বাদশাহ সূতা ঝুলাইয়া দিয়া দিয়া ঐ সমস্ত আবেদন পত্র তুলিয়া লইতেন। অর্দ্ধঘণ্টার অধিক কাল এইরূপ ক্ষেপণ হইত। তাহার পর রণহস্তী বাদশাহের সম্মুখে আনিয়া বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করিত। পরে অশ্বসাদী আবির্ভূত হইত। ৭টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশাহ প্রকাশ্য রাজসভায় দেওয়ানি-আমে বসিতেন। (১৬২৮ খৃঃ অব্দে কাষ্ঠময় এই সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩৮ অব্দে তাহার স্থানে ৪০টি স্তম্ভের উপর রক্তপ্রস্তরে বর্ত্তমান দেওয়ানি-আম বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ ২০১ ফুট ও বিস্তার ৬৭ ফুট। রজত নির্ম্মিত রেলিং চারিধারে শোভা পাইত)। এইখানে প্রধান বক্সি Paymaster General আসিয়া সামরিক কর্ম্মচারীগণের আবেদন পত্র পেশ করিতেন; বাদশাহ তাহার উপর আদেশ প্রদান করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, তোপখানার অধ্যক্ষ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং আদেশের সহিত বাদশাহ দত্ত উপদেশ ও বহুমূল্য পারিতোষিক লাভ করিত।

তাহার পরে বাদশাহের নিজস্ব ভূভাগের (crown lands) কর্ম্মচারী আসিয়া হিসাবাদি পেশ করিয়া আদেশ গ্রহণ করিত। তৎপরে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার শাসনবিবরণী ও বাদশাহ-পুত্রগণের আবেদন ও নিবেদন বাদশাহ নিজে কখন বা কর্ম্মচারীর মুখে শ্রবণ করিয়া তাহার উপর আদেশ দিতেন। তৎপরে শিক্ষার্থী, সুপণ্ডিত সেখ ও সায়েদগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ-সাহায্যের আবেদন পেশ হইলে বাদশাহ আবশ্যক মত সাহায্য দানের আদেশ দিতেন। পরে পূর্ব্বদিনের প্রদত্ত হুকুম কর্ম্মচারিগণ লিখিয়া আনিয়া বাদশাহ কর্ত্তৃক মঞ্জুর করিয়া লইত। তৎপরে বাদশাহের অশ্বশালার ভৃত্যেরা হস্তী ও অশ্বের সহিত তাহাদের খাদ্য লইয়া অদূরে দাঁড়াইত। হস্তী ও অশ্ব যাহাতে দুর্ব্বল না হয়, তাহার উপর বাদশাহ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ৯টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশাহ দেওয়ানি-খাসে যাইতেন। সেখানে বসিয়া বাদশাহ নিজ হস্তে প্রয়োজনীয় আদেশ লিখিয়া দিতেন, কখন বা তিনি যাহা বলিয়া যাইতেন, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা লিখিয়া লইত। লেখা শেষ হইলে ঐ সমস্ত লিখিত আদেশ বাদশাহ নিজ হস্তে সংশোধন করিয়া দিতেন। পরে ঐ সকল আদেশ-পত্র অন্তঃপুরে যাইত এবং বেগম মহতাজমহল আপনার নিকটে থাকা বাদশাহী-মোহর (Great seal) তাহার উপর ছাপ দিয়া দিতেন। পরে বাদশাহ নিজে মূল্যবান প্রস্তরের গঠনপ্রণালী সন্দর্শন ও জহরাৎখানা এবং রাজকীয় প্রাসাদের নক্সা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। মন্ত্রী আসফ খাঁ বাদশাহের মন্তব্য লিখিয়া (architects) শিল্পীর নিকট পাঠাইয়া দিত, কখন বা প্রাসাদ নির্ম্মাণকারী বাদশাহের নিকট আসিয়া বাদশাহের অভিমত জানিয়া যাইত। পরে বাদশাহ শীকারের সহচর সুশিক্ষিত অশ্ব, বাজ ও শ্যেনপক্ষী নিজে সন্দর্শন করিতেন। পরে বাদশাহ সাহাবুরুজে (royal tower) যাইতেন। নিতান্ত গোপনীয় মন্ত্রণা সেখানে চলিত। বাদশাহ-পুত্র ও নিতান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন অন্য কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বেলা ১২টার সময় বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন, সেখানে নেমাজ করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে একঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন। পরে সম্ভ্রান্ত দরিদ্রা অনাথা স্ত্রীলোক আসিয়া বেগমের প্রধানা পরিচারিকা সাতিউন্নিসা দ্বারা বেগমকে আপনাদের অভাব জানাইত। বাদশাহ প্রধানা বেগমের মুখে সমস্ত অবস্থা শ্রবণে আবশ্যক মত অর্থ-সাহায্য করিতেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বাদশাহ নেমাজ করিয়া আবার দরবারে আসিয়া বসিতেন ও অবশিষ্ট রাজকার্য্য সমাপন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বাদশাহ অন্যান্য প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত একত্রে নেমাজ করিতেন। সন্ধ্যার পরে দেওয়ানি খাসে রত্নখচিত আধারের উপর সুগন্ধ দীপালোক জ্বলিয়া উঠিত। এইসময়েও রাজকার্য্যের আলোচনা চলিত। পরিশেষে বিশুদ্ধ আমোদ ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত। বাদশাহ নিজে সুগায়ক ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সকলে সে আনন্দ উপভোগ করিত। রাত্রি ৮টার সময়ে বাদশাহ আবার সাহাবুরুজে যাইতেন এবং সেখানে রাজকার্য্য সম্বন্ধে গুহ্য আদেশ প্রদত্ত হইত। পরদিনের জন্য বাদসাহ আর কিছুই রাখিতেন না। সাড়ে আটটার সময় বাদশাহ অন্তঃপুরে যাইতেন এবং স্ত্রীকণ্ঠ-সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। পরে ১০টার সময় শয়ন করিতেন। পর্দ্দার বাহিরে থাকিয়া অপরে উচ্চরবে বাদশাহকে উপদেশগ্রন্থ, সাধুজীবনী, পূর্ব্ব রাজগণের ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনাইত। বাদশাহ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এই কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও বাদশাহ প্রত্যূষে ৪টার সময় উঠিতেন। বলা বাহুল্য মোগল-বাদশাহ-জীবন বিলাসের জীবন ছিল না।

Indian Review. Sep.

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯।

৭৮৪ সংখ্যা ১৮৩০ শক
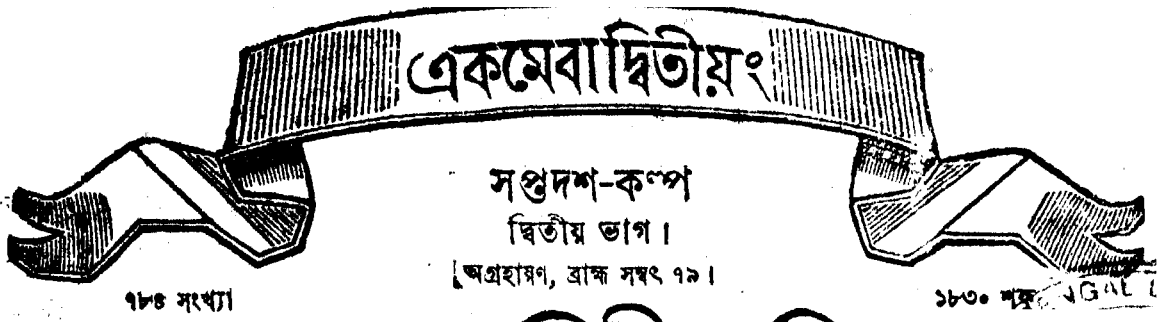
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত্। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

তৃতীয় উপদেশ।

অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ।

উদার-চেতা মনুষ্যমাত্রই স্বার্থনীতিকে পরিহার করিয়া, ভাবের নীতিকে আশ্রয় করে। নিম্নে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি—যাহার উপর ভাবের নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে করিয়া ঐ নীতি প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়।

যখন আমরা কোন ভাল কাজ করি, তখন কি আমরা ঐ কাজের পুরস্কার স্বরূপ অন্তরে একপ্রকার সুখ অনুভব করি না? এই সুখ অবশ্য ইন্দ্রিয়-সুখ নহে: আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে সকল বিষয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সকল ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্বিত বিষয়ের মধ্যে ইহার কোন মূলসূত্র কিংবা ইহার কোন মানদণ্ড নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হইলে যে সুখানুভব হয়, সে সুখের সহিত ইহার ঐক্য নাই। আমি কোন কাজে সফল হইয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, এবং আমি বরাবর সৎপথে চলিয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাব হয়—এই দুই ভাব এক প্রকার নহে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্যের সহিত যে সুখ জড়িত তাহা বিশুদ্ধ; আর যত প্রকার সুখ-সমস্তই অতীব মিশ্র। এই সুখই স্থায়ী, আর সমস্ত সুখ শীঘ্রই চলিয়া যায়। দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও মানুষ আপনার অন্তরে একটা স্থায়ী সুখের উৎস দেখিতে পায়। কারণ, ভাল কাজ করিবার সামর্থ্য মানুষের সকল সময়েই থাকে; পক্ষান্তরে এরূপ অসংখ্য অবস্থা আছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, সেই সকল অবস্থা হইতে আমরা যে সুখ পাই তাহা অতি বিরল ও অনিশ্চিত।

যেমন ধর্ম্মের কতকগুলি সুখ আছে, সেইরূপ পাপেরও কতকগুলি দুঃখ আছে। কোন অপকর্ম্ম করিয়া আমাদের ক্ষণিক সুখ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে আমরা যে কষ্ট পাই উহা সেই সুখের প্রায়শ্চিত্ত-পণ। এইরূপ সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। দুঃখ আসিয়া এইরূপ কর্ম্মের কলুষিত সুখ ও

অবৈধ সফলতাকে বিষময় করিয়া তোলে। এই দুঃখ মানুষের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, জর্জ্জরিত করে, দংশন করে। ইহাই অনুতাপের যন্ত্রণা।

আরও কতকগুলি তথ্য, উহারই মত সুনিশ্চিত :—আমি একটি লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখে দুঃখদুর্দ্দশার চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রকটিত। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা আমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারে—আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে; তথাপি কোন চিন্তা না করিয়াই কোন ফলাফল গণনা না করিয়াই, উহার কষ্ট দেখিবা মাত্র আমার কষ্ট হইল। ইহাই অনুকম্পা বা সহানুভূতির ভাব।

মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, মানুষের প্রফুল্ল-মুখ দেখিয়া আমাদের মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অন্যের আনন্দে আমাদের অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি হয়, এবং অন্যের দুঃখকষ্ট,-এমন কি, শারীরিক বেদনাও আমাদের শরীরে সংক্রামিত হয়। মাদাম সেভিঞে তাঁহার পীড়িত কন্যাকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা একটুও অত্যুক্তি নহে:—"তোমার বুকের ব্যথায় আমিও বুকের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছি।"

আমাদের হৃদয়কে, আমরা অন্যের সহিত একসুরে বাঁধিতে চাহি। এই কারণেই বড়-বড় সভায়, হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে; পাশাপাশি লোকের মধ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে। যেমন গুণমুগ্ধতা ও জ্বলন্ত উৎসাহ সংক্রামক, সেইরূপ আমোদ-কৌতুক ও বিদ্রূপ-পরিহাসও সংক্রামক। কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেও আমাদের মনে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতার মনে যে ভাব অনুভূত হয় তাহারই অনুরূপ ভাব আমরাও অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি আমরা কোন অসৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই অপকর্ম্মকারীর মনে যে ভাব উত্তেজিত হয়, আমাদের মন সেই ভাবের সহভাগী হইতে কখনই চাহে না; আমরা তাহার প্রতি বিমুখ হই; ইহা সহানুভূতি ও অনুরাগের বিপরীত ভাব—ইহা বিরুদ্ধানুভূতি; ইহাকে বলে বিরাগ।

আর কতকগুলি তথ্য পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আনুষঙ্গিক হইলেও, তাহার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতার সহিত আমার যে শুধু সহানুভূতি করি তাহা নহে, আমরা তাঁহার শুভ কামনা করি, আমরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার হিতসাধন করি, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে ভালও বাসি। যদি কোন মহৎকার্য্য, এই অনুরাগের বিষয় হয়, কিংবা কোন বীরপুরুষ এই অনুরাগের পাত্র হন, তবে এই অনুরাগ কখন কখন মত্ততার সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে। ইহাকেই পূজ্যবুদ্ধি বলে। ইহাই সেই পূজাঞ্জলি, যাহা বিশ্বমানব মহাপুরুষদের চরণে অর্পণ করে।

পক্ষান্তরে, যদি আমরা কোন মন্দকার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তবে সেই মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে, এবং আরও অধিক—আমরা তাহার অনিষ্ট কামনা করি; আমরা ইচ্ছা করি, সে তাহার অপকর্ম্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য মহাপরাধীরা আমাদের নিকট এত ঘৃণিত। এই ভাবটি শুধু বিরাগ নহে; ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাবও আছে। এই সকল মহাপরাধীরা আমাদের পথের কণ্টক বলিয়া আমরা তাহাদের অনিষ্ট ইচ্ছা করি। কোন ব্যক্তি

সৎ না অসৎ—এ বিষয় সম্বন্ধে বিবেক-বুদ্ধি কিছুই জানিতে চাহে না, শুধু ইহাই জানিতে চাহে, সে ব্যক্তি আমাদের পথের অন্তরায় কি না, সে আমাদিগকে অতিক্রম করে কি না, সে আমাদের অনিষ্ট করে কি না। কিন্তু আমরা যে ভাবটির কথা বলিতেছি তাহা একপ্রকার বিদ্বেষ যাহার মধ্যে একটু উদারতা আছে; যাহা স্বার্থ হইতে জন্মে না, যাহা শুধু ব্যথিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যের প্রতি আমাদের যেরূপ বিরাগ জন্মে, সেইরূপ আমরা নিজে যদি কোন মন্দ কাজ করি, আমাদের নিজের উপরেও বিরাগ জন্মিয়া থাকে।

খুব সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে, সহানুভূতি যেমন হিতৈষণা নহে, নৈতিক আত্মতৃপ্তিও সেইরূপ সহানুভূতি নহে। কিন্তু সহানুভূতি, আত্মতৃপ্তি ও হিতৈষণা—এই তিনটি ব্যাপার, মঙ্গলভাবেরই সাধারণ লক্ষণ। এই তিনটি ব্যাপার হইতে তিনটি বিভিন্ন অথচ অনুরূপ নীতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, তাহাই সৎকার্য্য যাহা করিলে আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ হয়, এবং তাহাই অসৎ কার্য্য যাহা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। কোন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেরূপ মনোভাব হয়, সেই অনুসারে সেই কার্য্যের ভাল মন্দ প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরে, ঐ ভাবটি আমরা অন্যের প্রতিও আরোপ করি। কারণ, কোন কার্য্য করিয়া অন্যের মনে কিরূপ ভাব হয়, তাহা আমরা নিজের ভাব হইতেই বিচার করিয়া থাকি।

আবার কতকগুলি দার্শনিক, সহানুভূতি ও হিতৈষণার একই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ইঁহাদের মতে, মানুষের প্রতি আমরা যে স্নেহ ও দয়াদির ভাব অন্তরে অনুভব করি, সেই সকল ভাবের মধ্যেই মঙ্গলের নিদর্শন ও আদর্শ অবস্থিত। মানুষ কোন বিশেষ প্রকার কাজ করিলে, তাহার শুভ কামনা করিতে,—তাহাকে সুখী করিতে স্বভাবতই আমাদের প্রবৃত্তি হয়; তাহার সেই কাজকে তখনই আমরা ভাল বলিতে পারি। ঐ প্রকারের কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া, যখন আমাদের ঐরূপ মনের ভাব স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন আমরা ঐ ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া বিচার করি। কাহারও কাজ দেখিয়া যখন অন্য প্রকার প্রবৃত্তি, অন্য প্রকার মনোভাব আমাদের মনে উত্তেজিত হয়, তখন আমরা তাহাকে অসৎ কিংবা অসাধু বলিয়া মনে করি।

কাহারও কাহারও মতে, স্বভাবতই যে কাজ আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে, সেই কাজই ভাল। যখন দেখি, দেশের জন্য কোন ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন সেই বীরত্ব, আমাদের মনেও কিয়ৎপরিমাণে বীরত্বের উদ্রেক করে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি-মূলক কোন কাজ,—নিতান্ত স্বার্থের সংস্রব না থাকিলে—আমাদের অন্তরে এরূপ সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে না। অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব লোকেরও অন্তরে ভালর প্রতি অনুরাগ ও মন্দের প্রতি বিরাগ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে।

এই সকল বিভিন্ন নীতিবাদকে, একটি নীতিবাদে পরিণত করা যাইতে পারে;—ইহাকে বলে ভাবের নীতিবাদ।

এই নীতিবাদের সহিত অহং-নিষ্ঠ নীতিবাদের যে প্রভেদ আছে তাহা সহজেই দেখাইতে পারা যায়। অহংনিষ্ঠা আপনাকে ভাল বাসা বই আর কিছুই নহে।

কিসে আপনার সুখ হয়, আপনার ভাল হয়, অহংপরতা শুধু তাহারই অন্বেষণ করে।

হিতৈষণা যেমন স্বার্থের বিরোধী এমন আর কিছুই নহে। এস্থলে স্বার্থের জন্য আমরা অন্যের শুভ ইচ্ছা করি না; শুধু তাহা নহে—আমরা অন্যের জন্য আপনাকে বিপন্ন করি; যে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সাধু ব্যক্তির জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিতেও উদ্যত হই। এই আত্মবিসর্জ্জনে যদি কিছু সুখ অনুভূত হয়, তবে সে সুখ ঐ ভাবটিরই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আনুসঙ্গিক ব্যাপার,—উহা তাহার লক্ষ্য নহে।

সে সুখ আমরা বিনা-চেষ্টায় ও বিনা অন্বেষণেই প্রাপ্ত হই। এ সুখের আস্বাদনে আমাদের অধিকার আছে, কেননা স্বয়ং প্রকৃতিদেবী হিতৈষণার সহিত ঐ সুখকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

হিতৈষণার ন্যায় সহানুভূতিরও অন্যের সহিত যোগ। উহাতে অহংএর কোন সংস্রব নাই। আমাদের অন্তঃকরণ এমন ভাবে গঠিত যে আমরা এক জন শত্রুর দুঃখেও দুঃখ অনুভব করিতে পারি। কোন ব্যক্তি একটা মহৎ কাজ করিলে, তাহা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলেও সেই কাজের প্রতি এবং সেই কার্য্যকারী ব্যক্তির প্রতি আমাদের কতকটা সহানুভূতি হইয়া থাকে।

অন্যের দুঃখে আমাদের যে সহানুভূতি হয় সে দুঃখ আমাদেরও কখন না কখন ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা হইতেই সহানুভূতির উৎপত্তি—কেহ কেহ সহানুভূতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময়, যে দুঃখের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, সে দুঃখ আমাদিগের হইতে এতদূরে অবস্থিত এবং সে দুঃখ আমাদের উপর পতিত হইবার সম্ভাবনা এত কম যে, তাহা হইতে আমাদের ভয়ের উদ্রেক হওয়া নিতান্তই অসঙ্গত। এ কথা সত্য; দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কারণ, যে দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই, তাহা আমরা অনুভব করিব কি করিয়া? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সহানুভূতির মুখ্য নিয়ম নহে। উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আমাদের নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া কিংবা নিজ দুঃখের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তবে আমরা অন্যের দুঃখে সহানুভূতি করি।

কোন প্রকার স্বার্থের ভাব দিয়া সহানুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথমত, বিরাগের ন্যায়, সহানুভূতিও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। তাহার পর, একথাও কেহ মনে করিতে পারে না, কোন ব্যক্তির হিতৈষণা আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা তাহার দুঃখে সহানুভূতি করি। কারণ, অনেকসময়েই, যাহাদের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, তাহারা আমাদের সহানুভূতি জানিতেও পারে না। যাহাদিগকে আমরা কখন দেখি নাই, যাহাদিগকে দেখিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই, যাহারা জীবিত নাই—এইরূপ লোকের জন্য যখন আমরা সহানুভূতি করি, তখন কি তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা কোন উপকার প্রত্যাশা করি?

অহংপরতা সকলপ্রকার সুখকেই প্রশ্রয় দেয়; কোন সুখকেই বহিষ্কৃত করে না; তবে কিনা, এমন কতকগুলি ভাবের সুখ আছে যাহা ইতর সুখ অপেক্ষা অধিক-স্থায়ী, ও ততটা মিশ্র বা অবিশুদ্ধ নহে, এবং যাহাকে মার্জ্জিত আত্মানুরাগ সেবনীয় বলিয়া মনে করে। ভাবের নীতিবাদ যদি শুধু হীন সুখের জন্যই ভাবের পক্ষপাতী হয়

তবে অহংনিষ্ঠ মূলক নীতিবাদের সহিত ভাবের নীতিবাদের কোন পার্থক্য থাকে না—ভাবের নীতিবাদের মধ্যে কোন প্রকার নিঃস্বার্থভাব থাকে না। তাহা হইলে "আমিই" আমাদের সকল কার্য্যের কেন্দ্র ও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু আসলে তাহা নহে। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য কোন কাজ করিলে যে সুখ অনুভূত হয়, ঠিক সেই আত্মবিস্মৃতিটুকুতেই সেই সুখের যাহা কিছু মনোহারিত্ব। প্রকৃতি-দেবী সহানুভূতি ও হিতৈষণার সহিত যদি কোন প্রকৃত সুখ সংযোজিত করিয়া থাকেন, তবে সে এইজন্য যে ঐ দুই বৃত্তির বিশুদ্ধতা ও নিঃস্বার্থপরতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—উহাদের আসল ভাবটি যাহাতে অবিকৃত থাকে। তোমার সহানুভূতি ও হিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ কোন সুখের প্রত্যাশা না করিয়া, শুধু সেই সহানুভূতি ও দয়ার পাত্রের কথাই তোমার ভাবা উচিত। নচেৎ, সেই সুখের মূলোচ্ছেদ হইবে,—যে সুখের অন্বেষণ করিতেছ সেই সুখই অন্তর্হিত হইবে। যে সুখ নিঃস্বার্থভাবের সহিত চিরসংযুক্ত—স্বার্থপরতা, যে-কোন আকারেই আসুক না, সে সুখকে কখনই ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না।

অহংনিষ্ঠ নীতিবাদ কিংবা অহমিকার নীতিবাদটা নিতান্তই অলীক—উহা একটা মিথ্যা কথা। উহা নীতির অনুমোদিত পবিত্র নামগুলি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নীতি-কেই অপসারিত করিয়াছে; বিশ্বমানবের ভাষা প্রয়োগ করিয়া বিশ্বমানবকে প্রতারিত করিয়াছে; এই ধার-করা ভাষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, সমগ্র মানবজাতির যাহা রত্নভাণ্ডার—সেইসব স্বাভাবিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, ভাব স্বয়ং মঙ্গল না হইলেও উহা মঙ্গলের বিশ্বস্ত সহচর ও নিতান্ত আবশ্যক সহকারী। উহা মঙ্গলের বিদ্যমানতার নিদর্শন এবং উহারদ্বারা সহজেই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, মিথ্যা তর্ক ও জল্পনা হইতে মনকে কোন-একপ্রকারে রক্ষা করে। অতএব মনোমধ্যে কতকগুলি মহৎভাব উত্তেজিত ও সংরক্ষিত করা মনের পক্ষে যেরূপ স্বাস্থ্যকর এমন আর কিছুই নহে; এইসকল মহৎভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থের দাসত্ব হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করে। সাধু ব্যক্তিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, তাঁহাদের মত কাজ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। আমাদের অন্তরে হিতৈষণা ও সহানুভূতির সাধনা করিলে, বদান্যতা ও প্রেমের উৎস আপনা হইতেই শতধারে উৎসারিত হয় এবং উদারতা ও আত্মোৎসর্গের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

তাই, ভাবের নীতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। ইহা প্রকৃত নীতি; কেবল, ইহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে, উহার এমন একটি মূলতত্ত্ব চাই, যাহা উহার প্রামাণিকতা স্থাপন করিতে পারে।

ভাল কাজ করিলে, অন্তরে একটা সন্তোষ অনুভব করা যায়, এবং মন্দ কাজ করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। ভাল মন্দ আমরা যে কাজ করি, এই দুইটি ভাব তাহাদের গুণ নহে; কারণ, ঐ দুইটি ভাব, কাজ করিবার পরে অনুভূত হয়। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমরা অন্তরে সন্তোষ অনুভব করিতে পারি? সেইরূপ, মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমাদের অনুতাপ হয়?—কখনই নহে। কোন কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে আমা-

দের মনের মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়াও হইয়া থাকে; এই বিচার-ক্রিয়ার পরে আমাদের হৃদয়ের কাজ আরম্ভ হয়। উত্তর-বর্ত্তী হৃদয়ের ভাবটি গোড়ার বিচার ক্রিয়া নহে; মঙ্গলের ধারণা হৃদয়-ভাবের উপর স্থাপিত নহে—পরন্তু হৃদয়ের ভাব হইতে মঙ্গল অনুমিত হইয়া থাকে। যাহা মঙ্গলের জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না, তাহা মঙ্গল ভাব হইতে উৎপন্ন—এইরূপ বলিলে 'চক্র-ন্যায়ের' ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

কোন কাজ ভাল বলিয়াই কি আমরা সেই কাজের সহিত সহানুভূতি করি না? কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি ন্যায়-বুদ্ধির অনুগত বলিয়াই কি আমরা সেই প্রবৃত্তির অনু-মোদন করি না? তাছাড়া, সহানুভূতি যদি মঙ্গলের প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে যাহা কিছুর জন্য আমরা সহানুভূতি করি তা-হাই কি ভাল নহে? কিন্তু শুধু নৈতিক বিষয়েরই সহিত আমাদের সহানুভূতির সম্বন্ধ নহে। আমরা এরূপ দুঃখ ও এরূপ আনন্দের সহিতও সহানুভূতি করি, যাহার সহিত ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন যোগ নাই। এমন কি, আমরা শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণারও সহিত সহানুভূতি করি। নৈতিক সহানুভূতি, সাধারণ সহানুভূতিরই একটা বিশেষ অবস্থা। কোন্ সহানুভূতি নৈতিক তাহা জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের সহিত সহানুভূতির মিল হয় না। কখন কখন যে সকল ভাবকে আমরা ভাল বলি না তাহাদিগের সহিতও আমরা সহানুভূতি করি।

হিতৈষণা সকল সময়ে, একমাত্র মঙ্গল-ভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। তাছাড়া, যখন কোন সাধুব্যক্তির প্রতি আমরা এই বৃত্তির প্রয়োগ করি, তখনও তাহা বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা করে এইরূপ বুঝায়; কারণ, কোন ব্যক্তি সাধু কি না, তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারাইআমরা নির্দ্ধারিত করি। কোন কার্য্যকারী ব্যক্তির শুভ কামনা করি বলিয়াই যে তাহার সেই কাজকেও আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি—এরূপ নহে; পরন্তু সেই কাজটা ভাল বলিয়াই সেই কাজের কর্ত্তাকে আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আর এক কথা। হিতৈষণার মধ্যে একটা অভিনব বিচার-ক্রিয়া আছে, যাহা সহানুভূতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বিচার ক্রিয়াটা এইরূপ;—ভাল কাজের কর্ত্তা সুখী হইবার যোগ্য; এবং মন্দ কাজের কর্ত্তা সেই কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কষ্ট ভোগ করিবে—ইহাই সমু-চিত। এই জন্যই আমরা শুভকারীর সুখ কামনা করি এবং অশুভকারীর সং-শোধন কল্পে দণ্ডভোগ প্রার্থনীয় মনে করি। হিতৈষণা এই বিচারক্রিয়ারই একটা শাব্দিক রূপ মাত্র।

অতএব, এই সকল ভাবস্ফূর্ত্তির গো-ড়ায় একটা বিচার ক্রিয়া হইয়া থাকে এইরূপ বুঝায়। এই বিষয়ে চক্র-ন্যায়ের ভ্রম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ভাবগুলি নৈতিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, ঐ ভাবগুলিই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধীয় ধারণা; কিন্তু আসলে আমা-দের মঙ্গলের ধারণা হইতেই ভাবগুলি ঐ সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ

বৈদিক ধর্ম্ম।

(জি-দে লাফোঁর ফরাসী হইতে)

বৈদিক যুগ—দিগ্বিজয়ের যুগ; এই যুগে, আর্য্যেরা সিন্ধুনদের প্রদেশে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত যাত্রা করে।

আর্য্য বংশের প্রথম দলেরা, স্বকীয় জন্মভূমি বাক্‌ত্রিয়ানা (বাহ্লিক) ছাড়িয়া, সিন্ধুনদ পার হইয়া, যখন এই বিশাল ভারত-প্রায়দ্বীপ জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা এই দেশের ভূম্যধিকারী অধিবাসীদিগের সংস্রবে আইসে। এই আদিম অধিবাসীদিগের নাম দস্যু। ঋগ্বেদের মন্ত্রে, এই দস্যুগণ,—বৃষ-মুখ, নাসিকাহীন, হ্রস্ববাহু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আর্য্যেরা উঁহাদিগকে ক্রব্যাদ নামে অভিহিত করিত; ক্রব্যাদের অর্থ—মাংসভোজী রাক্ষস। আর্য্যেরা মাংস স্পর্শ করিত না। এই সকল বর্ব্বরেরা কোন দেবতা মানিত না, তাহাদের কোন ধর্ম্ম ছিল না। বেদে উঁহাদের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে পীতজাতির সহিত অনেকটা মিল হয়। এই অনুমানের ভিত্তি—উঁহাদের দৈহিক প্রকৃতি। দস্যুদের রং ছিল কালো; উঁহাদের চর্ম্ম রোমশ ছিল না—যাহা আর্য্যদের একটা বিশেষ লক্ষণ; উঁহাদের নাক ছিল চ্যাপ্‌টা।

বেদে দেখা যায়,—দস্যুদের মধ্যে কতকটা ভৌতিক সভ্যতাও বিদ্যমান ছিল। প্রথম-প্রথম আর্য্যেরা, যাহাদেরই সংস্রবে আসিত, তাহাদের সকলকেই নির্ব্বিশেষে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত। পরে তাহারা জানিতে পারিল যে, দুই প্রকার দস্যু আছে; এক—পার্ব্বত্য দস্যু, আর এক মধ্য-দেশের দস্যু; প্রথমোক্ত দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ, ও দ্বিতীয়োক্ত দস্যুরা পীতবর্ণ।

"দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ, বন্য, ভীষণ হিংস্র, পর্ব্বতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, মানুষ অপেক্ষা বানরেরই সহিত উঁহাদের বেশী সাদৃশ্য, উঁহারা সমস্ত দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত—বিন্ধ্যাচলে উঁহারা 'পিল্ পিল্' করিতেছে বলিলেও হয়।"—Marians Fontane তাঁহার "বৈদিক ভারত" গ্রন্থে উঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

Burnouf তাঁহার প্রখ্যাত বেদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলেন :—"আর্য্য শব্দ, চিরকালই ভারতবর্ষে, "শ্রেষ্ঠ" —এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জর্ম্মান শব্দ Ehre, যাহা পুরাতন জর্ম্মান ভাষায় Ere—এইরূপ লিখিত হইত, উহা বোধ হয় এই আর্য্য শব্দেরই রূপান্তর। আদিম জর্ম্মান শব্দ Ermann—জর্ম্মান বীরের নাম—যাহাকে রূপান্তর করিয়া রোমকেরা Arminius বলিত, তাহাও বোধ হয় আর্য্য শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। পাশ্চাত্য এসিয়ায় যে সকল শ্বেতবর্ণের লোক সেমিটিক্ নহে, তাহাদেরই জাতিবাচক সাধারণ নাম—আর্য্য।

যে জাতি, সগর্ব্বে আপনাদিগকে "আর্য্য" বলিত, "বিশুদ্ধ" বলিত, "আলোকের শুক্লবর্ণ দুহিতার" বংশধর বলিত, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণ ছিল :—তাহাদের ফর্সা রং, তাহাদের কেশ ও শ্মশ্রু সূক্ষ্ম, তাহাদের গাত্র কোমল রোমে আচ্ছন্ন, তাহাদের নাসিকা সরল (সুশিপ্র), তাহাদের দেহযষ্টি পাতলা। পামিরের উচ্চ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ সাংকেতিক সামগ্রী। এই স্বল্প পুঁজি লইয়াই তাহারা চতুর্দ্দিকে সভ্যতা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ উন্নত সভ্যতা আর কোন জাতি কর্ত্তৃক কোনও কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে,—ভারতবর্ষে, এই আর্য্যেরাই ব্রাহ্মণিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। উঁহাদের বিপুল দার্শনিক ও সাহিত্যিক কীর্ত্তি; এই দর্শন ও সাহিত্যের সৃষ্টি গ্রীশ ছাড়া আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে, ইরানী আর্য্যেরাই পারস্য-রাজ্যের সংস্থাপক। দক্ষিণে, গ্রীশ ও ইটালী দেশের আদিম আর্য্যেরা (Pelasges) গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে; এবং আর্য্যদের শেষ শাখাগুলি, উত্তরে গিয়া—পাশ্চাত্যখণ্ডে গিয়া—সপ্তসিন্ধুর আর্য্যদের প্রায় দুই তিন সহস্র কিংবা ততোধিক বৎসর পরে, আবার আপনাদের মধ্যে একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

অতএব সপ্তসিন্ধুর দেশেই, আমাদের আর্য্যশাখার প্রবর্ত্তিত সভ্যতা সর্ব্বপ্রথমে বিকশিত হইয়া উঠে; যে মহতী কীর্ত্তির উপর এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তাহা—বেদ। এই বেদ—বৈদিক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মস্তোত্র সমূহের সংগ্রহ মাত্র।

ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য; আর তিনটি উহা হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের আর্য্যশাখার উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি। বুর্নুফ্ (Burnouf) অনুমান করেন, ন্যূনকল্পে খৃষ্টাব্দের ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়, কিন্তু কিংবদন্তী উহাকে আরও পুরাতন বলিয়া প্রতিপন্ন করে।

সম্ভবত এই বেদগ্রন্থ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সংকলিত হয়, তাই দ্বৈপায়নের নাম ব্যাস অর্থাৎ সংগ্রহকর্ত্তা।

কোলব্রুক্ বৈদিক জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—"যৎকালে বেদ-ব্যবহৃত পঞ্জিকার নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তখন প্রথম-অয়নান্ত, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে ও দ্বিতীয়-অয়নান্ত অশ্লেষা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে অবস্থিত ছিল এইরূপ গণনা করা হয়; অতএব খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্ বিভাগের এইরূপ অবস্থান ছিল।

ইতঃপূর্ব্বে বেদের একটা বচন হইতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, মাস-পর্য্যায়ের সহিত ঋতুপর্য্যায়ের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃত একটা বচন হইতেও দেখা যায়, দিগ্‌-বিভাগের সহিতও উহার মিল আছে।" সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখিলে,—ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলি, বাহ্য প্রকৃতি কিংবা আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত। কিন্তু ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে, বাস্তব বিষয়ের পাশা-পাশি, যেন একটা রূপক-কল্পনার জগৎ অধিষ্ঠিত। মন্ত্রগুলি যেখানে গীত হইত সেই সকল স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা, নৈসর্গিক ঘটনা, শত্রু-লোকের মধ্য-দিয়া আর্য্যদের যাত্রা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও গোর দিবার কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি—এই সমস্ত বিষয় ঋগ্বেদের মধ্যে আছে। ঋগ্‌বেদ হইতে আমরা আরও জানিতে পাই,—আর্য্যেরা তখন পিতৃশাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত,—তাহারা পৃথক্ ভাবে এক একটা পরিবারের মধ্যে বাস করিত; তাহারা কোন নগর নির্ম্মাণ করিত না; যখন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইত তখন তাহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। পিতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্তা, ও মাতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে একটা গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব ছিল। বর্ণভেদ প্রথা আদৌ ছিল না! পুরোহিত-সম্প্রদায় মোটেই ছিল না; তখন পুরোহিতের আধিপত্য ও পিতার প্রভুত্ব একত্র মিশ্রিত ছিল, পিতাই নিজসন্তানের উপদেষ্টা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও খুব সাদাসিধা ছিল: কোন দেবালয় ছিল না, কোন অনাবৃত স্থানে, শুধু এক-একটা ঘাসের চাপড়ায় যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইত, দুই কাষ্ঠ খণ্ডের সংঘর্ষণে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত, উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইত; পুরোহিত দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্যস্বরূপ মোদক-আদি মিষ্টান্ন ও সোমলতা অর্পণ করিত এবং পুরোহিতের সহকারীরা বেদমন্ত্র গান করিত। এই সাদাসিধা অনুষ্ঠান, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া হইত: উষাকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সূর্য্যাস্তকালে। অনেক দিন পর্য্যন্ত, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্রের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মমত ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই; তাঁহারা বলিতেন,—প্রাকৃতিক শক্তিদিগকে আহ্বান করাই ঐ সকল মন্ত্রের একমাত্র কাজ; এক কথায়, উহা বহুদেব-বাদাত্মক ধর্ম্ম; বৈদিক ধর্ম্মের আদি-যুগে, খুব সম্ভব, আর্য্যেরা বহুদেব-বাদী ছিল; যাই হোক্, বহুদেব বাদ ও মহাভূতের উপাসনা—এই দুয়ের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে। Burnouf বলেন:—"মনে হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল তাঁহাদের যে সকল প্রার্থনা মন্ত্রাকারে হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, উহা যে শুধু পরিবর্ত্তনশীল বায়ু ও বৃষ্টির উপর প্রভাব প্রকটিত করে তাহা নহে, পরন্তু উহা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও অধিকতর স্থায়ী প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহেরও অনুষঙ্গী ও সেই সকল ব্যাপারকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।"

বামদেবের রচিত মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই:—"কর্ম্ম-কার যেমন লৌহকে গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবতাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন।" অতএব বৈদিক মন্ত্রকারেরা স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহারা নিজেই দেবতাদের স্রষ্টা, সুতরাং মন্ত্র ব্যতীত দেবতাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, তাঁহারা দেবতাদিগকে বিশ্বাস করেন না। অতএব, বহুদেব-বাদের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য; এবং শব্দবাদ কিংবা বাণীবাদ (Logos) হইতে ইহার এক-পাদ মাত্র ব্যবধান।

কিন্তু 'অসুর'-বাদ সম্বন্ধেই অর্থাৎ প্রাণের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই বৈদিক ধর্ম্ম, কূট দার্শনিকতার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত 'অসু'-শব্দের অর্থ প্রাণ এবং র'-অক্ষর যোগে "প্রাণের উৎপাদক" এইরূপ বুঝায়—ইহাই অসুর-শব্দের মূল-অর্থ। আর্য্যেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। তাঁহারা বলিতেন, প্রাণই প্রাণকে পোষণ করে। প্রাণীরা অন্য প্রাণীকে আত্মসাৎ করে; সেই সব প্রাণী আবার, বৃক্ষ লতাদি খাইয়া জীবনধারণ করে; বৃক্ষ লতারা আবার উদ্ভিজ্জ ও জীবশরীরের পরিত্যক্ত অংশের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বলে "চক্র,"—অর্থাৎ প্রাণের চক্রগতি। প্রকৃতি-রাজ্যে, প্রাণ ও গতিশক্তি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ফলত, যাহার গতি-নাশ হয়—তাহারই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যুক্তির সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই, আর্য্যেরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অসুরেরা গতিমান্, তাহাদের শরীর দীপ্তিমান্—সুতরাং তাহারা সর্ব্বব্যাপী ও অমর।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই মতবাদটি, বহুদেব-বাদাত্মক; কিন্তু আর্য্যগণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা পরম-মূলতত্ত্বরূপ দার্শনিক একতার দিকে,—সেই প্রবণতাই উহাদিগকে একেশ্বরবাদে শীঘ্র উপনীত করিল। অগ্নিদেবের ধারণা হইতেই উহারা একেশ্বরবাদে আসিয়া পৌঁছিল। —"সমস্ত জগতের সত্তা তোমা হইতেই; কি হোম পাত্রে, কি মানব-হৃদয়ে, কি জলে, কি অগ্নি;

কুঞ্জে, সমস্ত প্রাণের মধ্যে তোমার মহিমার মধুর লহরী প্রবাহিত হইতেছে।” —এইরূপ বামদেব বলিয়াছেন। অতএব অমূর্ত্তভাবাপন্ন (idealised) অগ্নিই এই বহু-দেববাদের পত্তনভূমি। ভরদ্বাজের বেদমন্ত্র শ্রবণ কর: “সমস্ত জীবের মধ্যেই তাঁহার কর্তৃ-শক্তি বিদ্যমান ; সমস্ত দেবতারা মিলিয়া এই শক্তিমান পুরুষকে বেষ্টন করিয়া আছেন। যখন ভাবি, এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার অন্তরে রহিয়াছেন, তখন আমার কর্ণ ব্যথিত হয়, আমার চক্ষু কাঁপিতে থাকে, আমার মন সন্দেহে বিক্ষিপ্ত হয়। আমি কি বলিব? আমি কি চিন্তা করিব?” তবেই দেখ, ভৌতিক অগ্নি অমূর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ধারণার খুবই কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে এই অগ্নির আর বিশেষ অস্তিত্ব রহিল না; পুংলিঙ্গ-বাচক পরম পুরুষ ব্রহ্মা ইহাকে অধিকার করিলেন।

দীর্ঘতম ঋষির মহামন্ত্রটি ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে: “যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নি শরীর বিধান করিতেছেন—ইহা কি জন্মকালে কেহ দেখিয়াছে? পৃথিবীর মন, রক্ত, আত্মা কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই ঋষির কাছে কে আসিয়াছিল? আমি দুর্ব্বল ও অজ্ঞ—আমি এই সকল রহস্য উদ্‌ভেদ করিতে চাহিতেছি· আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর আরম্ভ কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ফলবান অশ্বের মূলবীজটি কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের আদিম আশ্রয় কে? এই পবিত্র বেদীটিই পৃথিবীর আরম্ভ এবং এই যজ্ঞ হোমই জগতের কেন্দ্র। এই সোমই ফলপ্রসূ অশ্বের বীজ। এই পুরোহিতই বাক্যের আদিম আশ্রয়। আমি জানি না, কাহার সহিত এই জগতের সাদৃশ্য আছে। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, এবং আমি চিন্তা-শৃঙ্খলে জড়াইয়া পড়িয়াছি···মৃত্যুর মধ্যেই অমৃত অবস্থিত ; এই দুই নিত্য বস্তু সর্ব্বত্রই গমনাগমন করে; কেবল লোকে একটি না জানিয়া অন্যটিকে জানে··· যে ব্যক্তি পরমপুরুষকে জানে না, সে এ মন্ত্রের কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; যে তাঁহাকে জানে, সে মৃত্যু ও অমৃতের সম্মিলনও অবগত আছে”···“যে দেবতা সমস্ত আকাশে পরিভ্রমন করেন, লোকে তাঁহাকে মিত্র বলে, বরুণ বলে, অগ্নি বলে; সদ্‌বিপ্রেরা এই অদ্বিতীয় পুরুষকে,—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্—এইরূপ বহুনামে ব্যক্ত করেন।”

অবশেষে প্রজাপতি জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন: তখন কিছুই ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। ভূও ছিল না,ভুবও ছিল না। এই আচ্ছাদনটি কোথায় ছিল?—কোন্ জলগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল? এই আকাশের গভীরতম প্রদেশ-সকল কোথায় ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা ও রাত্রির সূচনা করে এমন কিছুই ছিল না। একমাত্র তিনিই আপনার মধ্যে লীন থাকিয়া,বায়ুহীন নিঃশ্বাস নিঃশ্বসিত করিতেছিলেন। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। সেই আদিকালে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল; জলের কোন বেগ ছিল না ; সমস্তই একাকার ছিল। এই বিশৃঙ্খল একাকারের মধ্যে পরমপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহার করুণাতেই এই মহাবিশ্বের জন্ম হইল। আদিতে তাঁহার প্রেম আপনার মধ্যেই ছিল, পরে তাঁহার জ্ঞান হইতেই আদি-বীজ ছুটিয়া বাহির হইল। ঋষিরা তপস্যার বলে সৎ-এর সহিত অসৎ-এর যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন—এ সকল বিষয়ের জ্ঞাতাই বা কে? বক্তাই বা কে? এই সকল সত্তা কোথা হইতে আসিল? এই উৎপত্তি-ব্যাপারটা কি? দেবতারাও তাঁহা কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সত্তা কিরূপে হইল? যিনি এই জগতের আদি-স্রষ্টা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ইহা আর কে করিতে পারে? দ্যুলোক হইতে যাঁহার চক্ষু জগতের উপর নিপতিত রহিয়াছে তিনিই ইহা জানেন। তিনি ব্যতীত এ বিজ্ঞান আর কাহার হইতে পারে?”

একজন ঋষি, আর এক মন্ত্রে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছেন দেখিতে পাই:

“যিনি আত্মদা, বলদা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, দেবতারা যাঁহার শাসন অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার ছায়া মৃত্যু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? এই হিমবন্ত পর্ব্বত সকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার দ্বারা স্বর্গলোক, যাঁহার দ্বারা সুরলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অন্তরীক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার পালনীশক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান এই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি?”

পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বৈদিক যুগের শেষ হইল ; তাহার পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আরম্ভ। বেদের ভাষ্য যে উপনিষদ্—সেই সকল উপনিষদে পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

আমি কেবল উপনিষদ্ হইতে—যজুর্ব্বেদের উপনিষদ্ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব; “এই জগৎ এবং এই জগতে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সমস্তই বিধাতা-পুরুষের শক্তি দ্বারা পূর্ণ ; অতএব, পার্থিব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে অর্চ্চনা কর।·· মানুষ স্বকীয় কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে ; হে মনুষ্য! এই সকল কর্ম্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা কলুষিত না হয়। যাহারা পার্থিব সুখে আসক্ত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য-লোকে গমন করে। এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ চলেন না, অথচ তিনি মন হইতে বেগবান, তাঁহাকে দেবতারাও

ধরিতে পারে না। তিনি বাহ্যইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তিনি অন্তরিন্দ্রিয়দিগকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করেন। তিনি সমস্ত আকাশে অচলভাবে অবস্থিত হইয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন! তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে! যিনি পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। বিশ্বাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত সর্ব্বজীব অবস্থিত—ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার অবিদিত কি আছে? তিনি সর্ব্বগত, শুভ্র নির্ম্মল, আকার শিরা ও ব্রণহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি, তিনি মনীষী, তিনি পরিভূ, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথাযথ অর্থসকল বিধান করেন। যাহারা অবিদ্যাকে অর্চ্চনা করে তাহারা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে গমন করে, এবং যাহারা বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলেন, বিজ্ঞানের ফল একরূপ, অজ্ঞানের ফল অন্যরূপ; এই উপদেশ আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা একসঙ্গে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা প্রথমে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তাহার পর বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন। যাহারা সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে, যাহারা নশ্বর সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হয় তাহারা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলিয়াছেন, নশ্বর পদার্থের ফল একরূপ, অবিনশ্বর পদার্থের ফল অন্যরূপ। পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি নশ্বর পদার্থ ও লয়তত্ত্ব—এই উভয় জিনিষ একসঙ্গে শিক্ষা করেন, তিনি প্রলয়ের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরে অকৃত পদার্থের দ্বারা অমৃত লাভ করেন। গৌরবান্বিত হিরন্ময় অবগুণ্ঠনে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। জগৎ-পোষণ হে সূর্য্য! আমার সমক্ষে সত্যকে প্রকাশ কর—যাহাতে আমি তোমার চিরভক্ত হইতে পারি,—ন্যায়ের সূর্য্য ও সত্যের সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারি। হে লোকপোষণ সূর্য্য! হে নিঃসঙ্গ তাপস! পরম প্রভু পরম নিয়ন্তা! প্রজাপতির পুত্র! তোমার দীপ্ত কিরণ বিকীর্ণ কর; তোমার প্রখর তেজ সংহরণ কর, যাহাতে আমি তোমার মোহন রূপ ধ্যান করিতে পারি, তোমার মধ্যে যে দিব্য পুরুষ বিচরণ করেন, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতে পারি! আমার প্রাণবায়ু যেন আকাশের বিশ্বাত্মা ও ভূতাত্মার মধ্যে বিলীন হয়! আমার এই ভৌতিক ও নশ্বর দেহ যেন ভস্মে পরিণত হয়! হে দেব! আমার প্রদত্ত হবি তুমি স্মরণ করিও, আমার যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিও। হে অগ্নি! সরল পথ দিয়া, আমাদের সমস্ত পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গন্তব্য স্থানে আমাদিগকে উপনীত কর। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই অবগত আছ, আমাদের পাপ সকল অপনীত কর। আমরা তোমাকে প্রণিপাত করি!”

বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে উত্তীর্ণ হইবার পথে এই মহান উপনিষদই সন্ধিস্থান। এই উপনিষদ্‌ই বৈদিক মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার, এবং এই উপনিষদের মধ্যেই সেই সকল মতবাদের বীজ নিহিত ছিল যাহা পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের উদ্যমে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে।

বেদ যে ব্রাহ্মণ্য ভারতের চক্ষে এত পবিত্র, তাহার কারণ, বেদই সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের, দার্শনিকতত্ত্বের, সামাজিক ও রাষ্ট্রিকতত্ত্বের সূত্রস্থান; বেদ আসলে বিশুদ্ধ আর্য্য জাতির নিজস্বসামগ্রী, উহার মধ্যে কোন বিদেশী ‘ভেজাল’ প্রবেশ করে নাই, অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে যে আর্য্যজাতি আবদ্ধ ছিল, বেদ তাহাদেরই জ্ঞানোন্নতির ফল; একমাত্র নিজ সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যজাতি কিরূপে জ্ঞানসভ্যতায় উন্নতিসাধন করিয়াছিল—বেদ তাহারই নিদর্শন। অতএব, আর্য্যধর্ম্ম-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, যে সব সাঙ্কেতিক সামগ্রী আছে, যে সব মতবাদ আছে—সে সমস্তের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, বেদের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই, আর্য্যবংশীয় পুরাণাদির ভিতরকার ভাব অনেকটা বুঝা যায়—তাহাদের মূল মর্ম্ম অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এবং একমাত্র বেদই,—গ্রীক্, ল্যাটিন, স্ল্যাভ, জর্ম্মন ও সেল্টজাতির পুরাণাদির প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

এখন দেখা যাক, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিরূপে বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিল। দেশজয় করিতে করিতে, আর্য্যেরা যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজিত দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল, এবং সেই সব স্থানে স্থায়ী ভাবে বসতি করিতে লাগিল,—সেই পরিমাণে তাহাদের জীবন নির্ব্বাহের প্রণালীও একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

প্রথমে-তাহারা এক এক পরিবার পৃথকভাবে বাস করিত, তাহার পর তাহাদের এক একটা মণ্ডলী হইল। প্রথমে পরিবারের অন্তর্গত পিতাই পুরোহিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পৌরোহিত্য কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য, কতকগুলি বিশেষ পরিবারের হস্তে গিয়া পড়িল।

ফলতঃ, বৈদিকযুগের আরম্ভকালে, যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য একজন পুরোহিত আবশ্যক হইত, পরে তাহার জন্য সাত জন পুরোহিতের আবশ্যক হইল; তা ছাড়া, দস্যুদের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইত বলিয়া, কতকগুলি রণদক্ষ নেতার প্রয়োজন হইল। এই দুই প্রয়োজন হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি।

আর্য্যদিগের মনে কতকগুলি দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা ভাবিল,—ঐ সকল সমস্যা, যে সকল ব্যক্তির জীবনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, কেবল তাহারাই ঐ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ। তা ছাড়া আর্য্যেরা দেখিল, তাহারা স্বল্প লোক—পীত কৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য লোকের মধ্যে বাস করিতেছে, যদি তাহারা ঐ সকল লোক হইতে পৃথক্ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য, বিজেতারা যাহাতে বিজিত জাতির মধ্যে একেবারে মিশিয়া না যায়, যাহাকে আর্য্যেরা সগর্ব্বে

বলিত "অসুর-গর্ভজাত উৎকৃষ্ট জাতির নির্ব্বাচিত বীজ"—সেই বীজের বিশুদ্ধতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাহারা উদ্যমের সহিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অনার্য্য জাতিদিগের সহিত আর্য্যজাতির বিবাহ নিবারিত হইল, আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে, আপনাদের ধর্ম্মমত হইতে দূরে রাখিল, তাহাদের জন্য কেবল কতকগুলা নীচবিশ্বাস ও স্থুল উপধর্ম্ম রাখিয়া দিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের বর্ণভেদ-প্রথার উৎপত্তি। সকলের শীর্ষস্থানে দুই শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়; তারপর বণিক ও কারিগরশ্রেণী—বৈশ্য ও শূদ্র,— ইহারা বিজিত লোক লইয়া গঠিত।

যে বর্ণভেদ-প্রথা পরে এত নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহাই হিন্দু সভ্যতার শৈশব-দোলা বলিলেও হয়, এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে,—যাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত, সমস্ত দার্শনিকসিদ্ধান্ত নিঃসৃত—সেই পরমাশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ্য-যুগের আবির্ভাবই হইত না; যাহার অনুপম সৌন্দর্য্য, যাহার বিচিত্র আকার—সেই সংস্কৃত সাহিত্যের উদয়ই হইত না। এক কথায় এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে আর্য্যজাতির অস্তিত্বই থাকিত না; বহুকাল পরে, সমস্ত মানব-ব্যাপারে যাহা স্বভাবত ঘটিয়া থাকে—যখন প্রভুত্বের অপব্যবহার হইতে নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচার উৎপন্ন হইল তখনই শাক্যমুনি বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শান্ত-ভাবে একটা সমাজবিপ্লব সংঘটিত করিলেন;—অনার্য্য-জাতির কিয়দংশ লোককে আর্য্যজাতির নৈতিক মর্য্যাদার পদবীতে উত্তোলন করিলেন।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে হর্থাৎ যউপ্রেয়ো বৃণীতে।

"The Good and the Pleasant solicit men; the wise ponder over and distinguish between them. Blessed is he who clings to the good; he who chooses the pleasant misses life's highest end"

To let the flowers of love and reverence for God bloom in our hearts, to establish a deep, inalienable union between our soul and the supreme Soul, to follow His path and to do His work, this is *Sreyas*—the Good—Righteousness. To be led away by the impulses of an unregulated will, to be absorbed in the pleasures of this world, renouncing God and Religion, this is *Preyo* —the Pleasant—Worldliness. If we accept as our guide Righteousness that carries with it all that is good, it brings us to the presence of God, but if we follow Worldliness in the quest of sensual enjoyment we reach only the degrading depths of the Worldling.

অন্য চ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।

"The Good is one thing, the Pleasant another. These two attract the heart of man towards two different paths." Righteousness maketh us walk in the path of virtue which is narrow as the sharp-edged razor but in the end brings us to the Eternal, the Supreme Spirit; while Worldliness lures us on through a path not of God's unto the world and flings us into its boiling cauldron. There is the path that brings you sensual pleasure, wealth and renown, rank and power and absolute license; and there is also the path that guides you to a mine of inestimable treasures—self-respect, holiness, God and liberty; of these two paths which would you choose to follow? If you desire to invigorate and elevate your soul to meet the trials and troubles of life, if you wish to be blessed with the smiles of a clear conscinence, if your heart be fixed upon the Lord and pants after Him, then follow the path of Righteousness; Righteousness shall liberate you from the tangled knots that bind your heart to the world and bring you to the all-embracing Love, the infinite Holiness and Beauty of the Supreme Spirit. The path of Righteousness is the path for man, the path of Righteousness is the path for the *Devas*, the path we have to tread through Eternity; let us then give to Righteousness a place in our heart and shun Worldliness from afar. O my young freinds, put yourselves on your guard, and learn to tread the path of life with caution from the very dawn of your youth. You are in the period of life when the eyes of intelligence are keen and bright, when the body and mind are full of energy and enthusiasm; take heed that, notwithstanding these safe-guards at your command, you fall not into the dark pit of Worldliness which lies hidden, covered with green grass, beneath your feet.

Hark! the voice of Righteousness calleth, "Come unto me. I will lead thee to the all resplendent world of *Brahman*, the supreme Spirit."

In our heart rages the fierce contest between Good and Pleasure, between Righteousness and Worldliness. We live on the confines of these two contending elements. On one side is the Siren of Worldly pleasure, using all her bewitching arts to drag us down into the slough of the world, on the other is the Angel of Righteousness who, filled with a mother's love, clasps our hands and is eager to lead us to the land of Immortality. The Siren of Worldliness, with poison in her heart but honey on her lips, comes to us and tempts us saying:—

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ
বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্ ।

Accept from me sons and grandsons who shall live a hundred years, here are gold, herds of cattle, elephants, horses and equipages, all ready for thee. Follow me, and fragrant breezes shall cool thy body, in thy palace song and dance, laughter and merriment shall perenially scatter gladness and joy, sweet perfumes shall thrill thy senses, charming damsels shall serve and attend on thee, men shall prostrate themselves at thy feet, thou shalt be the master of all, thou shalt be the ruler over extensive kingdoms and thy fame shall spread through all lands. Accept me and I will fill the cup of thy desires." The pure-hearted resolute youth heard these words of evil counsel but remained unmoved and calm as the solemn ocean and answered thus:—

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ জরয়ন্তি তেজঃ ।

The temptations thou wouldst lead me into would wear out the vigour of all my senses ; our longest life is brief ; death is lurking behind me and on the slightest pretence it will rob me of my life and all my possessions, so keep thou thy horses and equipages, keep thy songs and dances for thyself. Nothing whatever that thou canst give me will ever satisfy me.

নবিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ ।

No man can be made happy by wealth. My heart cannot rest on transient mortal things. I look back upon my past life and can find no trace of true happiness, nothing but sorrow and grief and anguish, and prying into the future I can discern that the world will never give me the joy that is born of peace ; I shall not, therefore, be any more deceived by thy tempting promises and be whirled along the tortuous paths of the world. But if thou hast anything in thy gift so lovely and beautiful that by loving it I can love all the world besides and all the love of my heart may find the fullest satisfaction, yet never become exhausted ; if thou hast any boon so precious, then place it in my hands, I pray thee, that my restless soul may be soothed and comforted. Oh grant this my earnest prayer, and I shall remain thy devoted slave for ever ." Puzzled by these words, the Enchantress glided away in gloomy silence. Left to himself, that noble youth found his mental horizon dark and dismal and was overpowered by its depressing aspect. True, the temptations of the world had departed but the cravings of his soul were not yet satisfied. He was plunged into an ocean of misery, for neither the pleasures of the world nor the joys of heaven were his. Life seemed to wear to him the grim, sombre appearance of the graveyard. How dreadful is this state in a man's life when he has no appetite for the pleasures of the world neither does he enjoy the fellowship of God. Then we experience a deep craving for God but fail to discern the means of satisfying that inner craving. Then we become restless like the panting hart and pass through the direst tribulations of life. With a heart sore distressed, we eagerly ask of all whom we meet the way to save ourselves from the torments of this fiery ordeal but no answer do we get that can afford solace to the mind, that can cheer up the panting heart. When fallen into such a plight the forlorn and miserable youth wept and bewailed, when being without a refuge he sought the refuge of life, then the white-robed Angel of Righteousness appeared before him and soothed him with these words:—"Why dost thou mourn ? Why, consumed with grief and bereft of peace, dost thou roam in the wilderness ? Behold the image of love and goodness of Him whose love keeps the universe alive, and turn your

tears of grief into tears of love and joy. Secure peace of soul by wholly giving thyself up to him who is worthy of our highest devotion and love, the treasure of whose love, once possessed, endureth for ever. Awake ! Arise from the sleep of infatuation. I will take thee to the heavenly mansion of the all-loving Lord." The heart of that virtuous youth melted at these loving, life-giving words of the sweet spirit and anxiously did he interrogate him thus: "Who art thou ? Whence comest thou ? Where shall I go and what shall I do to assuage this tormenting agitation of my soul ? Where is the water of life that will moisten my parched "soul ?" In comforting tones the Angel replied. Behold that all pervading infinite spirit ; in thine inmost being is He present in all His glory, in thy finite soul is that infinite, Eternal Being firmly enthroned. Pray with all thy heart that He may reveal Himself to thy spiritual vision and anon will he manifest His ineffable light before thee and reveal to thee the straight path of virtue. The *Rishis* of old declare that path to be as the sharp edge of a razor, hard to tread; take refuge in the Almighty and thou shalt find that path easy to follow. In the pursuit of virtue one must be regardless of material comfort or discomfort. Follow it for its own sake, whether in prosperity or adversity. Remember that this world is not the goal of human existence; man's present state of living is a state of trial, a state of training and discipline. It is through sorrow and suffering, through dangers and perils and self-sacrifice that he advances in the path of virtue ; nay, at certain critical junctures, he may even be called upon to lay down his life cheerfully that God's will may be done. I do not tempt thee with vain promises of pleasure. Pleasure or enjoyment is not the end and aim of virtue. Can the transient pleasures of the world—enjoyment that depends on filthy lucre, on flesh and blood and can be obtained even by foul means, can this be the reward of Virtue which receives the homage of angels ? The reward of Virtue is Virtue itself, and the silent approbation of conscience,—its reward is God Himself. Therefore rouse thy drooping spirit and setting aside all the littleness that is thine, let thy whole heart be suffused with the light of Divine love. Keep nothing for thyself, give up thine all to Him and thou shalt instantly attain thy heart's desire of seeing the Lord face to face."

Laying to heart these profound, ennobling words of the gracious spirit, the pure-souled youth placed himself under the protection of the Almighty Lord and was infinitely blessed by beholding Him in his own soul. The world assumed in his eyes a newer and more gracious aspect and what had hitherto been to him an aching void now appeared to be full of a blessed reality. He surrendered his life to the Lord who is the source of life and, liberated from death, was blessed with life ever-lasting. Whosoever, like this youth, will follow Righteousness and consecrate his life and mind to God shall obtain Immortality as surely as he.

নানা কথা।

উত্তর মেরুর কর্ম্মবীর। উত্তর মেরু প্রদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ধর্ম্মপ্রচারক গ্রেন্‌ফেলের জীবন বাস্তবিকই অদ্ভুত। তিনি এস্কুয়িমো এবং লাব্রডোরবাসীদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই দুই জাতি গভীর সমুদ্রের জেলে, তিনি তাহাদের চিকিৎসক, গুরু ও বন্ধু। গ্রেন্‌ফেল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি পৃথিবীতে কিছু ভাল কাজ করিতে পারিবেন মনে করিয়া, উত্তর আমেরিকার এই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুর্ব্বর প্রদেশকে নিজের বাসভূমি মনোনীত করিয়াছেন এবং লাব্রাডোরে ব্যাট্‌ল্ হার্ব্বর (রণ-বন্দর) নামক স্থানে তিনি প্রধান বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই খানেই তাঁহার ভাণ্ডার থাকে। এই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনমত চিকিৎসার অস্ত্র ঔষধাদি, বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক, ফুট্‌বল্ আর তাঁর প্রাণভরা সদ্ভাব ও প্রসন্নতা সঙ্গে লইয়া তিনি শত শত ক্রোশ দূরে তুষারকঠিন অভ্যন্তর-দেশে যাইয়া থাকেন। ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল্ সেখানে যাইবার পূর্ব্বে, সে দেশের নরনারীরা ডাক্তারের কোন ধারই ধারিত না; এমন কি ডাক্তার জিনিসটা কি তাহারা কখনও চক্ষেও দেখে নাই। তিনি অনেকবার অনেকানেক দুঃসাহসের কাজ করিয়া শেষবারে ভয়ানক বিপদে পতিত হয়েন। তিনি বলেন "পাঁচ ক্রোশ দূরে, ভাসমান তুষার-

স্তূপের পরপারে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশে কতকগুলি রোগী দেখিবার জন্ম আমি ব্যাট্‌ল হার্ব্বর হইতে বাহির হইলাম। শীত বড়ই তীব্র, তাপমান যন্ত্র জিরো-রও দশ ডিগ্রী নীচে। আমি কুকুরের পাল সঙ্গে লইয়া বরফের উপর দিয়া চলিতেছিলাম। দেখি বরফস্তূপ ক্রমে তীর ছাড়িয়া ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অবস্থাটা ভাল করিয়া বোধগম্য হইতে না হইতেই দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বরফের টুক্‌রা পদভরে জলমগ্ন হইতেছে। কুকুরগুলিকে থামাইয়া রাখিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া একেবারে হিমসাগরের ভিতরে পড়িলাম।

কুকুরেরা ত আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন নিয়ম জানে না; তাহারা সকলেই প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম আমার কাঁধের উপর চড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহাদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত। সংগ্রাম করিয়া কুকুরদের তাড়াইয়া দিয়া পরে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে অবকাশ পাইলাম এবং একটা নিরেট বরফস্তূপের উপর চড়িলাম। কুকুরেরা নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। তাহারা আঁচড় পাঁচড় করিয়া ঐ স্তূপে উঠিয়া আমার কাছে আসিল।

সমস্ত কাপড়, এবং আমার ও কুকুরদের খাবার সবই হারাইয়াছি, কিছুই নাই। ঠিক সেই সময়ে উত্তর পশ্চিম হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের স্তূপটাকে খোলা সমুদ্রের দিকে বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মনে হইতে লাগিল এবার আর কোন আশা নাই। দেখি তাপমান যন্ত্র দ্রুত নামিতেছে। আমার গায়ের সব কাপড় একেবারে ভিজে। আমার চামড়ার বুট জুতা খুলিয়া একখণ্ড বুকে ও একখণ্ড পিঠে জড়াইলাম। বাতাস ও শীত বাড়িতে লাগিল, রাত্রি হইয়া আসিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম কুকুরেরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। কুকুরদের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন তাহারা ঠিক নেকড়ে বাঘের সমান হইয়া উঠে। তাহারা খাদ্যের জন্য ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল; আর অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যে আমাকে খাইয়া ফেলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

আমার মনে হইল আর রক্ষা নাই। কি করি, আর কোন উপায় না দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় তিনটি কুকুরকে মারিয়া ফেলিলাম। যখন মৃত কুকুরদের ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তখন কুকুরের পাল দূরে সরিয়া যাইয়া রাগে গোঁ গোঁ ও ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। শেষে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী কয়টা কুকুর আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সহিত লড়ালড়ি করিয়া, তাহাদিগকে দূরে হটাইয়া দিয়া ছাল ছাড়ান কাজ শেষ করিতে সক্ষম হইলাম। সমস্ত মাংস কুকুরের পালকে দিলাম এবং নিজের গা ঢাকিবার জন্যে চামড়াগুলা রাখিলাম। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিল।

সকাল হইলে দেখি তুষার-স্তূপ তীরবেগে কূল হইতে সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া এমন কোন দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড বা অন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না, যাহার উপর নিশান উড়াইয়া দূরস্থিত লোকদিগের নিকট আমার সঙ্কট জ্ঞাপন করিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে মৃত কুকুরদের পায়ের লম্বা লম্বা হাড়-গুলার কথা মনে পড়িল। সেই হাড়গুলা জুড়িয়া দণ্ড প্রস্তুত করিলাম, তাহার উপর আমার কামিজের এক টুক্‌রা কাপড় বাঁধিয়া দিলাম। লক্‌স্ কোব নামক স্থান হইতে জর্জ রিড এবং অন্যান্য গুটিকতক লোক এই নিশান দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা বোটে করিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন।"

বিগত সতের বৎসর হইতে ডাক্তার গ্রেণফেল এই জেলে-জাতির মধ্যে বাস করিয়া সকলকেই আবশ্যক—মত তিনি সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দুখানি হাঁসপাতাল জাহাজ চোরা বরফের ভিতর হারাইয়া গিয়াছে; এক্ষণে আর একখানি করিয়াছেন। অনেক সময় ক্রোশ ক্রোশ দূরে এমন সব স্থানে তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে যাইতে হয়, যেখানে রোগীদের নিকটে হাঁসপাতাল জাহাজ কোন রূপেই পৌঁছিতে পারে না। সে সব স্থানে তিনি তাঁর কুকুরের পাল সঙ্গে লইয়া, বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইয়া থাকেন।

এই কয় বৎসরের মধ্যে, ডাক্তার গ্রেণ্‌ফেল্‌ লাব্রাডোরে তিনটি হাঁসপাতাল, একটি শ্রম-শিক্ষা বিদ্যালয়, ছয়টি সহভোগী-সহভাগী (co-operative) ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ডাঙ্গা এবং জালিয়া নৌকার মধ্যে তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকল স্থানের রোগীরা সত্বর তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হয়।

ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল্‌ বলেন তুষারাবৃত উত্তরের এস্কিমো ও ইণ্ডিয়ান্‌ জাতিরা ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে। বন জঙ্গল ধ্বংস হওয়াতে করিবুরা (এক প্রকার জীব) আশ্রয়স্থান পায় না। করিবু অভাবে ইণ্ডিয়ন্‌ জাতি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে।

সাদা মানুষদের রোগবিষপ্রবল শরীরের নিকট যে সকল রোগ অগ্রসর হইতে পারে না, সে সমস্ত রোগ এস্কিমোজাতির রোগবর্জ্জিত বিশুদ্ধ শোণিত পান করিয়া বিষম পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। একবার এক

জন সাদা নাবিক, সমাস্ত সর্দ্দিগ্রস্ত অবস্থায়, এক এস্কিমো গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। সে গ্রামের জন সংখ্যা তিন-শত। কাঁচা সর্দ্দি সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিতে না উঠিতেই এক চল্লিশ জন এস্কিমো পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বহুদিন পূর্ব্বে, লর্ড ষ্ট্রাথকোণ বলিয়াছিলেন যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, উত্তর আমেরিকা-প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ লোক কে এবং কোন্ মহাপুরুষ আদর্শ-বীরের সমধিক সামীপ্য লাভ করিয়াছেন? আমি উত্তরে বলিব, ডাক্তার গ্রেণ্‌ফেল্। তিনি অতি সুদক্ষ খেলোয়ারের সহিত ফুটবল খেলিতে পারেন, হিমে রোগীর অসাড় অঙ্গ কাটিয়া দিতে সক্ষম, ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইয়া দিতে বিশেষ পারগ, গুরুতর নিউমোনিয়ারোগের যথোচিত চিকিৎসা করিতে বিশেষ দক্ষ এবং দুষ্ট লোকের উচিৎ শাস্তি দিতেও তৎপর; ডাক্তার গ্রেণ্‌ফেলের দ্বারা না হয় এমন অল্প কাজই আছে। উত্তর আমেরিকার মধ্যে তিনি একজন যথার্থ বীরপুরুষ।

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

Popular Science Siftings.

পদ্মার পুল। সারাঘাটের নিকটে রায়তা Raita নামকস্থানে পদ্মাবক্ষে লৌহ সেতু নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার উপর দিয়া রেল চলিবে। কেবলমাত্র সেতু নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা পড়িবে; সময়ও প্রায় ৫ বৎসর লাগিবে।

সাহায্য-লাভ। Salvation army মুক্তি-সেনা নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিবৎসর সাহায্য স্বরূপ সাধারণের নিকট ৩৪৫০০০ পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। উহার প্রতি ১২ পাউণ্ডের ভিতরে ১১ পাউণ্ড ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে, ১ পাউণ্ড মাত্র সামাজিক হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়। দানের মাত্রা দেখিয়া দাতা ও গৃহিতা উভয়েরই হৃদয়ের বিশালতা ও কার্য্য-কুশলতা বুঝা যায়। এত টাকা আহরণ ও বণ্টন উভয়ই বিস্ময়াবহ। হায়! কত শত হিতকর কার্য্য অর্থাভাবে এদেশে অনুষ্ঠিত হইতে পায় না। The christian life-5 th. sep.

কাচ। ভারতের সমতল ভূমি কাচ নির্ম্মাণ পক্ষে উপযোগী নহে। হিমালয় প্রদেশে কাচের কারখানা স্থাপনের উৎযোগ হইতেছে। গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে উৎপন্ন কাচ নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। ভারতে যে সকল কাচের সামগ্রী বিদেশ হইতে আইসে, তাহার মূল্য প্রায় এককোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে সমাকৃষ্ট হওয়া উচিত। The Indian world august. 1907,

রবার। রবারচাষের দিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ রূপে লক্ষ্য রহিয়াছে। সিংহল দেশ উক্ত চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ১৯০৬ সাল আসাম-জাত রবারের পরিমাণ প্রায় চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু সিংহল-জাত রবারের পরিমাণ ১৯০৫ সালের প্রায় এক লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড হইতে ১৯০৬ সালে ৩ লক্ষ সাতাইশ হাজার পাউণ্ডে উঠিয়াছিল।

শিক্ষা ব্যয়। ভারতে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে ইংরাজরাজ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জাপানের তুলনায় তাহা কিছুই নহে বলিতেও অত্যুক্তি হয়না। প্রতি সহস্র অধিবাসীর শিক্ষার জন্য জাপানের ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৯৫৲ টাকা, কিন্তু ভারতীয় রাজকোষে ১৬৭৲ টাকা দিয়াই ক্ষান্ত।

The Indian world

ধর্ম্মযাজকের আয়। Times পত্রিকায় প্রকাশ স্পেন দেশে (parochial clergy) যাজকের সাপ্তাহিক আয় পাঁচ সিলিং এর অধিক নহে। আয়ের অল্পতা হেতু প্রতিসপ্তাহে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের যথেষ্ট আয় আছে। হায়! আমাদের দেশেও পুরোহিতগণের আয় দিন দিন খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। টোলের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। শাস্ত্রজীবীর সংখ্যার অল্পতা দেশের প্রকৃত দৈন্যের পরিচায়ক।

মূর্ত্তিপূজা। মূর্ত্তিপূজার দিকে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা সকল দেশেই পরিলক্ষিত হয়। Times বলেন বিশেষ বিশেষ স্থানের Virgin কুমারী মেরীর মূর্ত্তির উপরে স্পেনের সমধিক শ্রদ্ধা। ঈশ্বরের উপরে যেন তত নহে। Barcelona বারসিলোনার নিকট সেণ্ট জোসেফের এক মূর্ত্তি আছে। প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র আবেদন তাঁহার মন্দিরে প্রেরিত হয়। বিশেষ দিনে শ্রদ্ধার সহিত ঐ আবেদন পত্রগুলি ঐ মূর্ত্তির সমক্ষে অগ্নিসাৎ করা হয়। প্রেরকগণের বিশ্বাস তাঁহাদের আবেদনপত্রে লিখিত পাপ হইতে পরিত্রাণের নিবেদন উক্ত Saint এর নিকট এইভাবে পৌছায়। Christian life. 12 th. sep.

নদী।—মিশর দেশস্থ (Nile) নাইল নদীতে বারশত মাইলের ভিতরে অন্য কোন নদী আসিয়া মিশে নাই। জর্দন নদী সর্ব্বাপেক্ষা বক্র এবং ইহার গতি সর্পের ন্যায়। ষাট মাইল পৌছিতে এই নদী দুইশত তের

মাইল পথ প্রদক্ষিণ করিয়াছে। গঙ্গার জলস্রোত রাইনের (Rhine) মত তিনটি নদী-প্রবাহের সমান। মিশিসিপির জলস্রোত তিনটি গঙ্গাস্রোতের সমান। আমেজনের জলস্রোত দুইটি মিশিসিপির সমান।

The Same paper.

আদি ব্রাহ্মসমাজের ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত মহারাজা	টিপারা	১০০৲
শ্রীমতী মহারাণী	কুচবেহার	৫০৲
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২৫৲
„ আর, এন, মুখোপাধ্যায়	„	২৫৲
„ মহারাজাধিরাজ	বর্দ্ধমান	২৫৲
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০৲
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১০৲
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১০৲
„ বি, এল্ চৌধুরী	„	১০৲
„ মহারাজা	মৈমনসিং	১০৲
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০৲
„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	„	১০৲
„ নরনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৫৲
„ বিহারীলাল মল্লিক	„	৫৲
„ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	„	৫৲
„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী	„	৫৲
„ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	„	৫৲
„ এস্, কে, লাহিড়ী	„	৫৲
„ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	„	৩৲
„ হরিশচন্দ্র ঘোষ	„	৪৲
		৩৩২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী,	জীবনপুর	৩।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন মিশ্র	দ্বারকাপুর	১।৵০
„ ডাক্তার ডি, এন, চাটার্জ্জি	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু রাধা গোবিন্দ রায়সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	৩৶০
„ „ রসিকলাল রায়	কলিকাতা	১॥০
„ „ বিপীনবিহারী ঘোষাল	হরা	২০৲
„ „ কালিকা দাস দত্ত	কুচবেহার	১৬৸৵০
„ মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	মুরশিদাবাদ	১২।৵০
„ বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায়	কলিকাতা	১৲
„ „ গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	৩৶০
„ „ মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৩৸০
„ „ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
„ সম্পাদক হরিসেনা মণ্ডলী	„	৩৲
„ বাবু পারীমোহন রায়	„	৮৲
„ „ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	„	৬৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ „ বিহারীলাল মল্লিক	„	৩৲
„ „ রামকৃষ্ণ মিশ্র	সম্বলপুর	৩।০
„ „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
„ „ রামচন্দ্র মিত্র	„	৩৲
„ „ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	রায়গঞ্জ	১৬৸৵০
„ „ প্রসাদদাস মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ সতীশচন্দ্র মল্লিক	„	৬৲
„ „ কেদারনাথ রায়	„	৩৲
„ „ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	„	৩৲
„ বাবু বনমালী চন্দ্র	„	৩৲
„ „ অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১॥০
„ „ চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩।৵০
„ কুমার হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	১॥০
„ „ গোবিনলাল দাস	কলিকাতা	৩৲
„ „ শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	„	৩৲
„ „ কানাইলাল শেঠ	„	৩৲
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	বিরামপুর	৩৶০
„ „ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ এস, কে লাহিড়ী	„	৩৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ „ গণেশপ্রসাদ লালা	দ্বারভাঙ্গা	৩৶০
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	৩।৵০
„ „ শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	৪॥০
„ „ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
„ „ ললিতমোহন রায়	„	১॥০
„ „ রজনীকান্ত পাট্টাদার	ডিব্রুগড়	৩৶০

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা।

"আসুপ্তে রামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তবার্ত্তয়া।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুরু বা আচার্য্য বিবেক বৈরাগ্যাদিযুক্ত ব্রহ্মবুভুৎসু শিষ্যকে 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' এই দুই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝান। 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' এতন্নামক যুক্তিদ্বয় ব্যতীত আরও অনেক যুক্তি বুঝাইবার উপযুক্ত সুপথ আছে, পরন্তু সে সকল উপরোক্ত যুক্তিদ্বয়ের পোষক বা সহায়। অধ্যারোপ শব্দের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

অধি+আ+রূপধাতুনিষ্পন্ন রোপ, অধ্যারোপ। অধি—অধিকরণ অর্থাৎ আধার। আ—মিথ্যা। রূপ—আকার। মিলনে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় যে, কোন এক আধারে অন্য এক মিথ্যা আশয় প্রতীত হওয়া। আধারটি সত্য, পরন্তু তাহাতে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা মিথ্যা। রজ্জুরূপ আধারে সর্পের আকার প্রতীতি হয়, এস্থলে প্রতীয়মান সর্প মিথ্যা, পরন্তু তাহার অধিকরণ রজ্জু সত্য। এতাবতা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অধ্যারোপ, আরোপ, ভ্রম, এ সকল কথার অর্থ এক বা অভিন্ন। বেদান্তোক্ত উক্ত পরিভাষার আরও বিশিষ্টার্থ এই যে, কোন এক সত্য বস্তুতে অন্য এক প্রকার আগন্তুক মিথ্যা জ্ঞান। আচার্য্য এবম্বিধ অধ্যারোপ বর্ণনা করিয়া শিষ্যকে এই বলিয়া বুঝান যে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি, যৎপরোনাস্তি মহান্ পরব্রহ্মে এই বিস্তীর্ণ বিশ্বের ভ্রম জন্মিয়া রহিয়াছে। অপিচ, যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞানের মিথ্যাত্ব অবধারণ করা হয়, তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও পশ্চাৎ এই দৃশ্যমান্ বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। এই বিশ্ববিভ্রম প্রাপ্তি, বদর মুষ্টির ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, অর্থাৎ ইহার মধ্যে ক্রম সন্নিবিষ্ট আছে। অর্থাৎ একটীর পর আর একটি, তাহা হইতে অন্য একটি, এতদ্রূপক্রমে পরম্পরা নিয়মে উৎপন্ন হইয়াছে। তাদৃশ ক্রমপরম্পরার অন্য নাম সৃষ্টি। বেদান্ত মতের এই সৃষ্টিক্রম অতি বিস্তীর্ণ ও নিতান্ত দুষ্প্রতর্ক্য। সেজন্য কেবল তাহাই অন্যূন ২টি প্রবন্ধে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণন করা উচিত বোধ করিলাম। এবং 'অপবাদ' যুক্তি

কিরূপ? তাহা সৃষ্টিক্রম বর্ণনার পরে বলা সঙ্গত বোধ করিলাম। এ প্রবন্ধে, কেবল সেই বিশাল বিশ্ব-বিভ্রমের অন্তর্গত আত্ম-বিভ্রমের দুই চারিটি কথা আলোচিত হইল। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, বেদান্তীরা শিষ্যের নিকট নিম্ন প্রকার আত্মবিভ্রম বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ স্বমতের আত্মতত্ত্ব শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়া থাকেন। তদ্ যথা—

সকলেরই একটা সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে। তাহা অহং—আমি—এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এ জ্ঞান সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ নহে; পরন্তু সংসার দৃঢ় হওয়ার পক্ষে কারণ। এই শরীরের মধ্যে "প্রকৃত বা বাস্তব আমি" কি?—তাহা নিশ্চিত রূপে জানা আবশ্যক, নচেৎ সামান্যতঃ আত্মজ্ঞানে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। তাদৃশ বিশেষ-নিশ্চয় ব্যতীত মোক্ষপথের পথিক হওয়া যায় না। আমি কি? আত্মা কি? কিম্বিধ পদার্থ আত্মা,—জানিবার জন্য সেই সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত শত শত লোক অনুসন্ধানতৎপর হইয়া রহিয়াছে, অথচ তাহাদের ভাগ্যে প্রকৃত বা বাস্তব আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। কেবল এক একটা সম্প্রদায়ের অর্থাৎ দলের সংগঠন হইয়াছে ও হইতেছে মাত্র।

এক দলের ধারণা, এই দেহই আত্মা। ইহাতে যে জ্ঞান-নামক গুণ আছে, তাহা ইহারই ধর্ম্ম অথবা দেহোপাদান ভূত-সংঘের সংযোগবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন। যেমন তণ্ডুল ও গুড় প্রভৃতি মদ্যোৎপাদন-দ্রব্য পরিমাণ-অনুসারে পচাইলে তাহাতে মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ, দৈহিক উপাদানের সমবায়ে দেহেও চৈতন্য নামক গুণের আবির্ভাব হয়। এই চেতনা গুণ যাবদ্দেহ তাবৎ বিদ্যমান থাকে, দেহের বিনাশে তাহারও বিনাশ হয়। অপিচ, প্রত্যেক মনুষ্যই দেহকে লক্ষ্য করিয়া "আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি রুগ্ন" ইত্যাদি প্রকার অনুভব ও তৎপ্রকাশক ভাষা উচ্চারণ করিয়া থাকে, ইহাদের সেই অনুভবই দেহাত্মতাবাদের প্রমাণ।

অন্য এক সম্প্রদায়ের ধারণা—এই শরীরস্থ ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টিই আত্মা, শরীর আত্মা নহে। কেন না, ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, এবং বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অপিচ, আমি কাণা, আমি বধির, এইরূপ অনুভূতি ইন্দ্রিয় সমষ্টির আত্মত্ব প্রমাণ।

আবার অন্য দলের মত—প্রাণই আত্মা; অন্য কোন আত্মা নাই। কারণ এই যে, প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয় সকল নিঃপাতিত হইয়া থাকে। প্রাণের আত্মত্বে আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি তৃষ্ণার্ত্ত, এইরূপ সমানাধিকরণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সকল প্রাণধর্ম্ম, তৎসমানাধিকরণ্যে, "আমি" এতদ্রূপ অনুভব হওয়ায় সুতরাং প্রাণেরই আত্মত্ব নিশ্চয় হয়।

অপর এক দলের মত—প্রাণও আত্মা নহে। যখন দেখা যায়, মনের অভাবে প্রাণাদিরও অভাব সংঘটন হয়, তখন মনকেই আত্মা বলা উচিত। কেননা ইচ্ছা, দ্বেষ, ও কামনা, প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সহিত আত্মার অর্থাৎ আমার একধর্ম্মিতা দৃষ্ট হয়। যথা—আমি ইচ্ছা করি, আমি কল্পনা করি, ইত্যাদি।

অন্য এক দল বলেন, মনও আত্মা নহে, বিজ্ঞান নামধেয় বুদ্ধিই আত্মা, এই বিষয়ে যুক্তি ও অনুভব এই যে, মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কারণ। কর্ত্তা যাহার ব্যাপারে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তা-

হার নাম করণ। যেমন ছেদন-ক্রিয়ার করণ অস্ত্র, সেইরূপ। অপিচ, কর্ত্তা না থাকিলে করণ কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা উচিত যে যাহা মনের প্রেরক তাহাই আত্মা। মনের প্রেরক বুদ্ধি, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

এইরূপে কেহ আত্মাকে জ্ঞানগুণশূন্য ও জড়পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা আত্মাকে খদ্যোতিকার ন্যায় জড় অজড় প্রকাশ অপ্রকাশ দ্বিরূপবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন। কেহ বা আত্মাকে শূন্য পদার্থ বলিয়া মনে করিতে লজ্জিত হন না।

শ্রুতি, যুক্তি, আত্মবিৎগণের অনুভব,—এই প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, ঐ সকল আত্মা নহে। আত্মা ঐ সকলের উপরে, ঐ সকলের প্রকাশক, ঐ সকলের সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদ বিশুদ্ধ চৈতন্য। যাহাকে জ্ঞান বলা যায়, সে সকল অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যে বিবিধ জ্ঞান অনবরত উত্থিত ও লুক্কাইত হইতেছে, বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মা সে সকলকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা "আমি বুঝিয়াছি, আমি জানিয়াছি" ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখ করিয়া থাকি। বাহিরের দৃশ্যসমূহ হইতে শরীরবর্ত্তী বুদ্ধি পর্য্যন্ত পদার্থ জড়, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য। চৈতন্য-রূপই আত্মার প্রকাশ্য। এই স্থানে এই-রূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা চৈতন্যের প্রকাশ্য, তাহা তাহাই জড় ও নশ্বর; আত্মজ্ঞ ঋষি তপস্বিগণ এইরূপে অনুভব করেন যে, আমি ব্রহ্ম। তাহার কারণ এই যে, "আমি" এই উল্লেখ অর্থাৎ এই কথাটি মুখ্যতঃ সাক্ষাৎ চেতনাকে লক্ষ্য করে এবং সাক্ষাৎ চেতনার অন্য নাম ব্রহ্ম। তাহাই দেহে দেহে—প্রত্যেক দেহের মনোরূপ উপাধিতে, দর্পণে মুখবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন একই চন্দ্র নানা জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অজ্ঞান বালকেরা নানা চন্দ্র মনে করে তেমনি সেই আকাশের ন্যায় সর্ব্ব-ব্যাপী একই আত্মা নানা আধারে প্রতি-ফলিত হওয়ায় অজ্ঞ জীব নানা আত্মার অ-স্তিত্ব মনে করিয়া থাকে। এই আত্মা যেমন প্রত্যেক দেহে প্রোক্ত প্রকারে বিরাজিত, তেমনি দেহের বাহিরেও প্রত্যেক জড়পদা-র্থেও বিরাজিত। আত্মজ্ঞগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্যবহারিক পদার্থের মধ্যে যে নাম ব্যবহার হয় ও সে সকলের যে একএকটা রূপ দেখা যায়, সে সমস্তই অজ্ঞানের প্র-ভাব বৈ অন্য কিছুতে নহে। তবে, সেই সঙ্গে সে যে সকলের সত্তা, প্রকাশ, ও প্রিয়াপ্রিয় ভাব প্রকাশ করে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ।

"অস্তি, ভাতি, প্রিয়ং, রূপং. নাম চেত্যর্থ পঞ্চকম্।
আদ্যএবং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

অস্তি—আছে। ভাতি—প্রকাশ। প্রিয়—ভাল ভাব। রূপ—আকৃতি। এই পাঁচ লইয়া জগৎ। জগতে এই পাঁচের অ-তিরিক্ত অন্য কোনও ভাব নাই, ঐ পাঁচের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ভাব ব্রহ্মের নিদর্শন বা ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া বিবেচ্য এবং পশ্চা দুক্ত দুটিভাব অর্থাৎ নাম ও রূপ এই দুই ভাব জগৎ বলিয়া গণ্য।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১। তংব্রহ্ম আত্মবিৎ পশ্যতি জ্ঞানযোগাৎ ন কর্ম্ম-যোগেন।

২। জ্ঞানেন বিদ্বান্‌স্তেজ অভ্যেতি নিত্যং
ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থা।

"তুমি সত্যরূপা সর্ব্বাদিম অথবা অ-

নাদি ও অসত্য জগৎ প্রপঞ্চের অতীত ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ। তাহা ধীর ও ব্রহ্মচর্য্যাদিসম্পন্ন সাধু সজ্জনেরই প্রাপ্য। তাহা পাইলে মর্ত্ত্যলোক অতিক্রম করা যায়। (ব্রহ্মব্যতীত) প্রকাশ আর কাহারও নাই। যিনি আত্মবিৎ, আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি জ্ঞানযোগে তাদৃশ তাঁহাকে দেখিতে পান, এই সমুদয় জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। যে তাঁহাকে অভিহিত প্রকারে জানে সে অমৃত অর্থাৎ অজ্ঞান-পরিমুক্ত বা সংসার-পরিমুক্ত হয়।"

মৃত্যু এবং অমৃত, এই দুইটিই হইতেছে জীবের বন্ধন এবং স্থিতি লাভের হেতু। "অশনায়াহি মৃত্যুঃ" শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া সৈব মৃত্যুঃ সাহি মৃত্যোর্লক্ষণং। সর্ব্বদা খাই খাই করিয়া বেড়ানটাই মৃত্যুর লক্ষণ। উদর পূর্ণ করিয়া বেড়ানটাই মৃত্যুর লক্ষণ। কেবল খাওয়া নহে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহাই খাওয়া। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সমূহে আমরা অহরহ বিচরণ করিতেছি—সুন্দর দেখিয়া চক্ষু বিচার করে ও বাছিয়া লয়, সুশ্রাব্য দেখিয়া কর্ণ বিচার করে ও বাছিয়া লয়, সুগন্ধ দেখিয়া নাসিকা বিচার করে ও বাছিয়া লয়। এই রূপ বিচার ও গ্রহণ কার্য্যেই আমাদের জীবন ও বিচার বুদ্ধি অহরহ নিযুক্ত, ইহাতেই আমাদের কর্ম্মশালা, পণ্যশালা, শিক্ষা ও সাহিত্য পূর্ণ। ইহাই আমাদের বন্ধন-পাশ। যদি ইহাতেই আমরা সমস্ত জীবন ক্ষেপন করি, তবেই মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু এই মৃত্যু-লক্ষণ কর্ম্মজালের মধ্যেই সেই অমৃত বিদ্যমান। সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে শুক্তি আহরণের ন্যায় এই মৃত্যু-সাগর পার হইয়া অমৃত গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাতে যুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃতরস পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন, সেই প্রাচীন কালের ঋষিরাই বলিয়াছেন যে,

"ইহৈব সন্তোঽথবিদ্মস্তদ্বয়ং।
নচেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।"

আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি। যদি তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। ঈশ্বরই একমাত্র শাশ্বত অমৃতানন্দ ও সুখ-আধার।

যেমন একটি শকট-চক্রের নাভি নামক মধ্য বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া তাহার নেমি ও অর সকল নিয়মিত হয়, সেইরূপ একটি নিরবলম্ব সুখ-স্থানকে অবলম্বন করিয়া সংসারে কর্ম্ম-চক্র নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি" ইহাতে সুখ আছে মনে করিয়া মানুষ সেই কর্ম্ম করে "না সুখং লব্ধা করোতি" যাহাতে সুখ নাই এরূপ কর্ম্ম করে না, "সুখমেব লব্ধা করোতি" সুখ যাহাতে পায় সেই কার্য্যই করে, "সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" অতএব প্রকৃত সুখেরই অনুসন্ধান করিবে। এইরূপ উপদেশ দিয়া আদি ঋষি সনৎকুমার ব্রহ্মপ্রাণ নারদের নিকট সেই নিরবদ্য সুখের স্বরূপ-লক্ষণ এই রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"যোবৈ ভূমা তৎসুখং" যিনি ভূমা অনন্ত মহান্ তিনিই সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি" এই অল্পে সংসারে সুখ নাই। অতএব হে নারদ, তুমি সেই ভূমা মহান্ পুরুষের অনুসন্ধান কর। কিন্তু হায়! নেমি ও অরজাল বেষ্টিত ঘূর্ণায়মান শকটচক্রের সঞ্চারে নিবদ্ধ-চক্ষু কে তাহার নাভিস্থানের প্রতি প্রণিধান করে? নিয়ত উত্থান পতনশীল সংসারের কর্ম্ম-চক্রে নিবদ্ধ-মনশ্চক্ষু কয় জন মনুষ্য তাহার নাভিস্বরূপ সেই নিরবলম্ব সুখ স্থানের

প্রতি প্রণিধান করে? যেমন মৃগতৃষ্ণিকাতে জলভ্রম হয় এবং তাহাতে নির্ব্বোধ হরিণ-শিশু তৃষ্ণা নিবারণ মানসে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া নিষ্ফল পরিশ্রমে কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই ঘোর সংসারে সেই নিরবদ্য সুখ-ভ্রমে এক প্রচণ্ড বিষয়-তৃষ্ণার উদ্ভব হইয়াছে। সুখ-তৃষ্ণাতুর অবোধ মনুষ্যেরা সুখ ভ্রমে সেই বিষয়-তৃষ্ণায় পতিত হইয়া নিষ্ফল পরিশ্রমে কাতর ও অবসন্ন হইয়া অবশেষে অসুখের গভীর জলধিগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। যাহা প্রকৃত সুখ তাহাই জীবন, তাহার বিপরীত যাহা তাহাই মৃত্যু। শিখ গুরু নানক বলিয়াছেন—

"আখা জীবা, বিসরে মর যাই। আওখন আখা সাচা নাও, সাচা নামকী লাগে ভুক্, ও খাবে সো তরিয়াবে দুখ।"

ঈশ্বরের নামের আখ্যাই জীবন, আর তাহার বিস্মৃতিই মৃত্যু। সত্য নামের আখ্যাই প্রকৃত আখ্যা। যাহার এই সত্য নামের ক্ষুধা লাগে, সে যদি তাহা খায়, তবে সে সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

দেখিতে পাই যে এখানে মৃত্যুই অমৃতের দ্বারপাল হইয়া রহিয়াছে, সংসারের যে দিক হইতে যাত্রা করি, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই মৃত্যুর কটাক্ষ দর্শন করি। সংসারে যত প্রকার অশান্তি আমরা ভোগ করি, তাহার সকলেরই মূলে এক মাত্র মৃত্যুই জাগিয়া রহিয়াছে। গভীর রজনীর নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে ঝিল্লিকারা ঝিঁ ঝিঁ শব্দে যেমন জাগিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের এই মোহ-নিদ্রিত প্রাণের মধ্যে—অজ্ঞান-সুষুপ্তির গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে এক মাত্র মৃত্যুই তদ্বৎ জাগিয়া রহিয়াছে। তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব, যদি মৃত্যুভয় না থাকিত তবে সে অভাবের প্রতি তুমি কি কখন ভ্রুক্ষেপ করিতে? তুমি রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছ, যদি মৃত্যুভয় না থাকিত তবে তাহা কি তোমার এত যন্ত্রণাদায়ক হইত? স্ত্রী পুত্রের বিয়োগভয়, তস্করের উপদ্রব, হন্তার শাণিত ছুরিকা, উগ্রদংষ্ট্রা পশুগণের মুখব্যাদান প্রভৃতি যে কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমার মনে সতত আশঙ্কার সঞ্চার করে, একমাত্র মৃত্যুভয়ই তাহার মূল কারণ।

যেমন সূর্য্যের অভ্যুদয়ে অন্ধকার চলিয়া যায়, অথবা অন্ধকার চলিয়া গেলে যেমন জ্যোতির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা হইলে তাহার অন্তঃকরণ হইতে মৃত্যুভয় চলিয়া যায়। অথবা, প্রথমে মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারিলে বিষয়-বৈরাগ্য রূপ অরুণোদয়ের পশ্চাতেই মানবের ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মার আনন্দচ্ছটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তখন সে তাহার সেই চিরাভিলষিত অনন্ত সুখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। মহর্ষি সনৎসুজাত ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ইনি মহাজ্ঞানী এবং নারদাদি মহর্ষিগণের উপদেষ্টা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে স্বীয় পুত্রগণের মৃত্যু নিশ্চয় কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভের জন্য সেই মনীষী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

সনৎসুজাত! যদিদং শৃণোমি
মৃত্যুর্হি নাস্তীতি তবোপদিষ্টং
দেবাসুরা আচরন ব্রহ্মচর্য্যং
অমৃত্যবে তৎকতরন্ন সত্যম্।

হে সনৎসুজাত! শুনিতে পাই, আপনি বলেন, মৃত্যু নাই, কিন্তু দেবাসুরেরা মৃত্যু না হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন। অতএব মৃত্যু নাই

এবং আছে এই দুইপক্ষের মধ্যে কোনটি সত্য। ইহা শুনিয়া সনৎসুজাত বলিলেন, হে ক্ষত্রিয়, মৃত্যু আছে এবং নাই, জীবের অবস্থাভেদে এই দুইটিই সত্য। মোহাধীনের মৃত্যু হয়, ইহা জ্ঞানীগণের মত, অতএব আমি প্রমাদ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান শূন্যতাকেই মৃত্যু, অপ্রমাদকে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত্যু-হেতু বলিয়া থাকি। প্রমাদ বশতই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুর বশায়ত্ত হইয়াছে এবং অপ্রমাদপ্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ মৃত্যু কিছু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তু সকলকে ভক্ষণ করে না, কেননা, মৃত্যুর রূপই উপলব্ধি হইতে পারে না। কেহ কেহ উক্ত প্রমাদ-মৃত্যু ভিন্ন যম নামক মৃত্যুদেবতাকে কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন এই যম দেবতা শিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে শিব হইয়া এবং অশিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে অশিব হইয়া পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু ইহা আত্মার অবসাদ দশাতেই কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যখন, মনুষ্যগণ কেবল অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ আর আত্মযোগ অর্থাৎ স্বরূপানুসন্ধান করে না এবং স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। তখন ক্রোধ, লোভ, ও প্রমাদ ভিন্ন মৃত্যুর আর অন্য রূপ কোথায়? যাহারা আত্মযোগে বঞ্চিত তাহারা মোহপ্রযুক্ত ঐ ক্রোধাদিরূপ মৃত্যুর বশীভূত হইয়াই দেহত্যাগ করে। তখন ক্রীড়াকর ইন্দ্রিয় সকলও তাহাদিগের সহগামী হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুরক্ত মানুষেরা কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি সময়ে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ভোগসাধন স্বর্গাদিস্থলে গমন করে, সুতরাং মৃত্যুকে আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাভিমানী জীব, ব্রহ্ম প্রাপ্তি-সাধন যমনিয়মাদিযোগ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল ভোগ-যোগ অর্থাৎ ভোগ লাভের বাসনাতেই সংসার-চক্রেই ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরুষের মিথ্যা-বিষয়াসঙ্গে স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার ইন্দ্রিয় বর্গের মহামোহজনক। সঙ্কল্প-কৃত মিথ্যা-বিষয় যোগ দ্বারা অন্তরাত্মা নিয়ত অভিহত হওয়ায় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে অনুস্মরণ পূর্ব্বক কেবল বিষয় সকলেরই উপাসনা করে। বিষয়-চিন্তাই প্রথমে লোক সকলকে নিহত করিয়া ফেলে, পরে কাম ও ক্রোধ ক্রমে ক্রমে তাহার অনুগামী হয়। বিষয়-চিন্তা, কাম ও ক্রোধ এই তিনে সমবেত হইয়া অবোধ মনুষ্যদিগকে মৃত্যু সন্নিধানে লইয়া যায়; এই নিমিত্তই অজ্ঞান মরণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু জিতচিত্ত নিষ্কাম পুরুষেরা অধ্যাত্মযোগাভ্যাসরূপ ধর্ম্মের সাহায্যে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। ধৈর্য্যসম্পন্ন অধ্যাত্মযোগযুক্ত পুরুষ উৎপতিত বাসনা-পুঞ্জ দ্বারা প্রতিবোধিত না হইয়া পরমাত্মানুধ্যান করত জ্ঞানবলেই তৎসমুদয় নিহত করেন। যে বিদ্বান্ মানব এইরূপে কাম সমস্ত নিহত করেন, যমের ন্যায় হইয়া অজ্ঞান আর তাঁহাকে ভক্ষণ করে না। পুরুষ কামনানুসারী হইলে কামের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; পরন্তু কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখরূপ যে কিছু রজোগুণ থাকে, সকলই দূর করিয়া দেয়। কামই প্রাণীবর্গের অজ্ঞান ও দুঃখরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু ইহাতে বিষয়-বিবেক-শূন্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য করত হা-হুতাশ করিতে থাকে। কামদ্বারা যাঁহার চিত্ত অভিভূত হয় না, সেই অমূঢ়-বৃত্তি পুরুষের নিকটে মৃত্যু কি করিবে? তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণ-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়। অতএব কামের আয়ু অর্থাৎ হেতুভূত মূল

অজ্ঞান অপনোদন করিতে হইলে কোন প্রকার কামনারই অনুসরণ বা তাহাতে আসক্ত হইবে না। জীবাত্মা পরমাত্মারই ছায়া ও পুত্র। তাহাকে অর্থাৎ আপনার আত্মত্বকে ক্রোধ লোভ সম্বলিত ও মোহবান্ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানই মৃত্যু। এইরূপে মৃত্যুর উৎপত্তি হয় জানিয়া মনুষ্য জ্ঞানে নিষ্ঠা করত মৃত্যু হইতে আর ভয় পায় না। কেননা মৃত্যুর গোচর প্রাপ্ত হইয়া দেহ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের গোচর হইলে মৃত্যু স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়।

"এবং মৃত্যুং জায়মানং বিদিত্বা
জ্ঞানেন তিষ্ঠেন্ন বিভেতি মৃত্যোঃ।
বিনশ্যতে বিষয়ে তস্য মৃত্যুঃ
মৃত্যোর্যথা বিষয়ং প্রাপ্য মর্ত্যঃ।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে কতকগুলি অর্থহীন প্রলাপ বাক্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অভ্যুদিত হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি প্রবৃত্তিসঞ্জাত উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মভার স্কন্ধে লইয়া পিতৃসমাজের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। অথচ তাঁহার ইহাও উদ্দেশ্য নহে যে, কূপমণ্ডুকের স্বল্প কূপোদককেই অপার সমুদ্র জ্ঞানের ন্যায় যাঁহারা আপনার ক্ষুদ্র সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পান না, তাঁহাদের সেই সংস্কারকে আরও তমসাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের রসাতল গমনের গতি প্রশস্ত করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, বৈদিক ব্রহ্মতত্ত্ব মানব-সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করুক, ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে সংস্কার-শরীরের যে যে অঙ্গ ভ্রান্ত-ব্যাধিতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সঞ্জীবনী-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে সবল ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে ব্রহ্মজ্ঞান-শলাকা দ্বারা উন্মীলিতচক্ষু হও এবং তোমার সংস্কারের ছিদ্র ভেদ করিয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত কর এবং দেখ যে তোমার জাতির বাহিরেও তোমার দেশের বাহিরে বিদেশেও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জাগ্রত, ঈশ্বরের জ্ঞান-জ্যোতি কেমন প্রখর, তাঁহার প্রেম কেমন সুন্দর ও বিশদ। সূর্য্য কিরণ যেমন সকল দেশেই এক, সকলের পক্ষেই সমান, সেই রূপ অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রেম অনন্ত বিশ্বে এক, সর্ব্বত্রই সমান। এই জ্ঞান লাভ হইলে এবং পর্য্যটন দ্বারা তাবৎ ভূভাগে ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা দর্শন করিলে আমাদের ব্যক্তিগত অন্তঃকরণ হইতে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ অধোবদন হইয়া পলায়ন করে ও আমরা পবিত্র হইয়া এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে উদারতা ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যামৃতকে লাভ করিতে চাহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে বহু শাস্ত্র-জল্পনা দ্বারা ও অজ্ঞানকৃত বিতর্ক দ্বারা আমরা যে সংস্কারান্ধ হইয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞান রূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহা ছেদন করিয়া আমরা পাশ মুক্ত হই ও অপার অনন্ত প্রেম জলধিতে ভাসমান হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করি। পুনরায় সনৎকুমারের কথাতেই বলি—

ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি
বেদেন বেদং ন বিদুর্ন বেদ্যম্।
যো বেদ বেদং স চ বেদ বেদ্যম্
যো বেদ বেদ্যং ন স বেদ সত্যম্।
যো বেদ বেদান্ স চ বেদ বেদ্যম্
ন তং বিদুর্বেদবিদো ন বেদাঃ।
তথাপি বেদেন বিদন্তি বেদম্
যে ব্রাহ্মণা বেদ বিদো ভবন্তি।

চারি বেদের কোন বেদই বাক্যের অগোচর সম্বিদ্ রূপ পরমাত্মার জ্ঞাতা নহে। কারণ

যাহা যাহা বেদের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ তাহা তাহাই জড়, মৃত। মৃতের পরমাত্মা জানা দূরে থাকুক, সে প্রপঞ্চ জানিতেও পারে না। জড় পদার্থের অস্তিত্ব চেতনের অধীন—“তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি’। সুতরাং যিনি তথাবিধ মুখ্যবেদ অর্থাৎ সম্বিদ্‌রূপ পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্ববিৎ হন অর্থাৎ সমস্তই জানেন। যিনি প্রপঞ্চরূপ বিদিত হন, বেদরূপ অবিদিত থাকেন, তিনি সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ পরমাত্মা বিদিত নহেন। যিনি কেবল ঋক, যজু, সাম এই সকল জানেন তিনি বেদ্য অর্থাৎ অনাত্ম প্রপঞ্চই জানেন। তিনি যে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা সে সকল জানেন সে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জানেন না। সুতরাং সে প্রকার বেদজ্ঞ অনাত্মবিৎ। কেননা তাহারা বাক্য মনের অতীত পরমাত্মা বিদিত নহেন। কেবল তাঁহারাই অনাত্মবিৎ তাহা নহে, ঋক্ প্রভৃতি বেদও অনাত্মবিৎ, অর্থাৎ ঋগাদি বেদও তাঁহাকে সুব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। ঋগাদি বেদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ তদ্‌বাচক শব্দের দ্বারা সম্বিদ্‌রূপ পরমাত্মাকে বুঝাইতে অক্ষম বটে, পরন্তু ঐ সকল বেদ তাঁহাকে কথঞ্চিৎ লক্ষণাদির দ্বারা—ভাবভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করিতে, বুঝাইতে সক্ষম। শঙ্করাচার্য্য সনৎকুমারের বাক্যার্থ এই রূপে বুঝাইয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মও আমাদিগকে এই একই সত্যকে বুঝাইবার জন্য এবং তদ্রূপ আচরণ করিবার জন্য উপনিষদের মহাপ্রাণকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

(তৃতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

আর একটা কথা;—হৃদয়ের ভাবগুলা অনুভব-শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে, এবং উহারা অনুভবশক্তির আপেক্ষিক ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিও কতকটা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাব উপভোগের শক্তি সকল লোকের সমান নহে; কাহারও বা স্থূল প্রকৃতি, কাহারও বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। তোমার কামনাগুলা যদি উগ্র ও প্রচণ্ড হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের উপর তোমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুখই সহজে জয়ী হইবে। তোমার প্রকৃতি যদি শান্ত হয়, তাহা হইলে সেরূপ কখনই হইবে না। বায়ুর অবস্থা, স্বাস্থ্য, রুগ্নতা,—আমাদের নৈতিক বোধশক্তিকে হয় নিস্তেজ নয় সতেজ করিয়া তোলে। বিজন বাসে যখন মানুষ আপনাকে লইয়াই থাকে, তখন অনুতাপের বল পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়;—মৃত্যুর সন্নিধানে দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু জনতা, সংসারের কোলাহল, বিষয়াকর্ষণ, অভ্যাস, উহাকে একেবারে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিলেও কতকটা নিস্তেজ করিয়া রাখে। সময় বিশেষে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ে উৎসাহ সকলদিন সমান থাকে না। সাহসেরও ক্ষণিক বিরাম আছে। “অমুক দিন সে সাহস দেখাইয়াছিল”—একথা ত সর্ব্বদাই শোনা যায়। আমাদের অন্তরতম হৃদয়ের ভাবও অনেক সময়ে আমাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে। আমাদের যে ভাব পরম বিশুদ্ধ, অতীব উচ্চ আদর্শের—তাহাও কতকটা আমাদের দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কবির ভাবস্ফূর্ত্তিতে, প্রেমিকের অনু-

রাগে, ধর্ম্মবীরের জ্বলন্ত উৎসাহতেও মধ্যে মধ্যে অবসাদ উপস্থিত হয়—এই সমস্ত অনেক সময়ে নিতান্ত হেয় ভৌতিক কারণের উপর নির্ভর করে। যখন ভাবের স্রোতে এরূপ জোয়ার ভাটা নিত্য উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবকে আদর্শ করিয়া সকল মানুষের জন্য কি একই বিধিব্যবস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে?

সহানুভূতি ও হিতৈষণাও এই ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশীলতার হাত এড়াইতে পারে না। অন্যের অনুভব করিবার শক্তি সকলের সমান নহে। যাহারা অতিশয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে—অন্যের দুঃখ কষ্ট তাহারাই বেশী বুঝিতে পারে; সুতরাং অন্যের দুঃখকষ্টে তাহাদেরই বেশী অনুকম্পা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের কল্পনাশক্তি বেশী, তাহারা অন্যের অনুভূত মনোভাব আপনার মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া, অন্যের দুঃখ বেশী অনুভব করিতে পারে। কেহ বা দৈহিক সুখ দুঃখের জন্য, কেহবা মানসিক সুখ দুঃখের জন্য সহানুভূতি করিতে পারে। এই প্রকার সহানুভূতির মধ্যেও আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে। শুধু প্রকার-ভেদ নহে—এমন কি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যথিত হইলে আমাদের অন্তরে যে ধিক্কার উপস্থিত হয়, গুণীর গুণপনার উপরে অত্যধিক সহানুভূতি থাকিলে, সেই ধিক্কারের ভাব অনেকটা কমিয়া আসে। এই জন্যই ভল্‌টেয়ার রুসো ও মিরাবোর দোষ আমরা দেখিয়াও দেখি না, তাঁহাদের শতাব্দির কলুষরাশিকে আমারা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করি। কোন দণ্ডার্হ ব্যক্তির মহাপরাধে আমাদের অন্তরে যতটা ঘৃণা উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহার কষ্টে সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ায়, সে ঘৃণা কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসে। যাহাকে মঙ্গলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ডরূপে খাড়া করা হয়, সেই সহানুভূতির ত এইরূপ চঞ্চল ও টলমান্ অবস্থা। সহানুভূতির ন্যায় হিতৈষণাতেও এইরূপ তারতম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নেহ ও প্রেমের ভাব কাহারও কম, কাহারও বেশী। তাহার পর, সহানুভূতির ন্যায়, হিতৈষণাতেও নানা প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া তাহাকে বাধা দেয়। বন্ধুতার স্থলে, আমরা ন্যায়কে অতিক্রম করিয়াও, একটু বেশী দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।

ভাবের খামখেয়ালী উচ্ছ্বাসের প্রতি বেশী কর্ণপাত না করাই কি সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না? বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও পরিশাসিত হইলে, এই হৃদয়ের ভাবই, বুদ্ধির বেশ একটি সহায় হইতে পারে; কিন্তু আপনার হাতে উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, উহা অচিরাৎ উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালী আবেগে পরিণত হয়। ইহাতে করিয়া মন, কার্য্য করিবার একটা উত্তেজনা ও শক্তি লাভ করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ও অব্যবস্থিত হইয়া উঠে; গোড়ায় উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, অবশেষে অহংপরতার নিকটবর্ত্তী অথবা একেবারেই অহংপরতায় উপনীত হয়; মঙ্গলের ধ্রুব আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, অনুভবশীলতার অদৃঢ় ভূমিতে কখনই স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না; ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবেগের আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে; উদারতা হইতে অহংপরতায় উপনীত হয়; আজ হয়ত আত্মহারা ঔদার্য্যের শিখরে আরোহণ করিবে; কাল ব্যক্তিত্বের হীনতার মধ্যে নিপতিত হইবে।

এইরূপে ভাবের নীতি, স্বার্থের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অসম্পূর্ণঃ—১ম

উহা মঙ্গলের ধারণাকে এমন একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, যে ভিত্তিটি স্বয়ং এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ২য় উহা এমন একটা নিয়মের নির্দ্দেশ করে যাহা অধ্রুব—যাহা বিশ্বজনের পক্ষে অবশ্য-পালনীয় নহে।

মনুর উপদেশ।

কর্ম্ম যোগ।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগদেহ সম্ভবম্
কর্ম্মজা গতয়োনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

কায় মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয় সেই সকল কর্ম্ম হইতেই মানুষ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হয়॥

তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ
দশ লক্ষণ যুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥

দেহীর মনকেই মনোবাক্-কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন প্রকার দশ লক্ষণযুক্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবে॥

পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥

পরদ্রব্যে অভিধ্যান, মনদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ মানসিক অপকর্ম্ম॥

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধম্॥

পরুষ বাক্য, মিথ্যা বাক্য, পৈশুন্য অর্থাৎ পরোক্ষে পরের দোষ কথন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ—এই চতুর্ব্বিধ বাচিক অপকর্ম্ম॥

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

অদত্ত ধনগ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা এই ত্রিবিধ শারীরিক অপকর্ম্ম॥

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্
বাচাবাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্॥

দেহী, মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মন দ্বারা, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্য দ্বারা, এবং শারীরিক কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে॥

বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ড স্তথৈব চ
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যাহার বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্যকে দমন করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বলা যায়॥

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ
কাম ক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া সর্ব্বভূত সম্বন্ধে মনুষ্য যখন ত্রিদণ্ডের যথাব্যবহার করেন, তখনি তিনি সিদ্ধি লাভ করেন॥

ভূতাত্মা জীবাত্মা, ও পরমাত্মা।

যোহস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে
যঃ করোতি তু কর্ম্মানি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥

যিনি এই আত্মার কারয়িতা অর্থাৎ যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এবং যে কর্ম্ম করে, বুধেরা তাহাকে ভূতাত্মা বলেন॥

জীবসংজ্ঞোহন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখ্যং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥

তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ॥

ভূতাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় হইতে ভিন্ন জীব সংজ্ঞক অন্তরাত্মা সর্ব্ব দেহীরই সহজাত; ইনিই জন্মে জন্মে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। ঐ মহান্ (অন্তরাত্মা) ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ে পঞ্চভূত-সম্পৃক্ত, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং ইহারা উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সর্ব্বজীবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে॥

অসঙ্খ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥

উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যে সকল জীব সতত কর্ম্ম করে, তাহারা এই পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য মূর্ত্তিরূপে নিষ্পতিত হইয়া থাকে।

জীবের কর্ম্মফল ও বিভিন্ন দেহ ধারণ।

পঞ্চেভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ॥
তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেনেহ যাতনাঃ
তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ ॥
সোঽনুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয় সঙ্গজান্
ব্যপেত কল্মষোঽভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌযসৌ॥
তৌ ধর্ম্মং পশ্যতস্তস্য পাপঞ্চাতন্দ্রিতৌ সহ
যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সম্পৃক্তঃ প্রেত্যেহ চ সুখাসুখম্ ॥
যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ
তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ॥
যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামী প্রাপ্নোতি যাতনাঃ।
যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ
তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ ॥
এতা দৃষ্টাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্ম তোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ ॥

দুষ্কৃতকারীর জন্য পঞ্চভূতের অংশ হইতে পরলোকে আর একটি যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ দেহারম্ভক ভূতের অংশে লীন থাকিয়া দুষ্কৃতিকারী ঐ শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সে বিষয়াসক্তি দোষে যমলোকে দুঃখাদি অনুভব করিয়া ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া, ঐ উভয় মহোজা মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করে। মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়ে আলস্যরহিত হইয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী থাকেন এবং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীব,—ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন তবে সূক্ষ্মভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখ ভোগ করিতে থাকেন। আর যদি তাঁহার অধর্ম্ম অধিক ও ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে যমযাতনা ভোগ করে এরূপ একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর, নিজ কর্ম্মানুসারে আবার ভাগমত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতুক জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

বিশ্বের রহস্যময় আবর্ত্ত।

("সায়ান্স্ সিফ্টিং-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত")

সর্ ডেবিড জিল্ বলেন "ধৈর্য্য সহকারে সুদীর্ঘকালব্যাপী শ্রম এবং অঙ্কফলের তন্ন তন্ন গণনা দ্বারা এই মহান ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, আকাশের অধিকাংশ স্থান যুড়িয়া দীপ্তিমহিমাময় দুই তারকা-স্রোত বহমান, দুই স্রোত বিপরীতমুখী। বিশ্লেষিত রশ্মির দুর্ব্বোধ্য লিপির ব্যাখ্যা দ্বারা এই আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, উভয় স্রোতের তারকা-সমূহের গঠন ও বর্দ্ধন প্রণালী একই প্রকার, তাহাদের রাসায়নিক উপাদান সকলও একই প্রকারের।"

এই আবিষ্কার এত আধুনিক যে, ইহার বিশেষ বিবরণ এখনও অসম্পূর্ণ, জ্যোতির্ব্বেত্তারা কেবল বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন; ইহা হইতে আর কি কি প্রসূত হইতে পারে তাঁহারা বলিতে অক্ষম। এই তথ্যটীর মধ্যে বিরাট নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত, কেননা, সমস্ত বিশ্ব যে এক অবিচ্ছেদ্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, ইহা তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে; ইহা জাগতিক যন্ত্রের যে প্রণালী প্রকাশ করিতেছে তাহা স্বপ্নেও কখন দেখা যায় নাই। সর্ ডেবিড জিলের

বর্ণনানুযায়ী একটি চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।

মনে কর একটি বালক ঘাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মস্তকের অনেক উর্দ্ধে অদৃশ্য বায়ুসাগরে কোটী কোটী আকন্দ তুলাখণ্ড ভাসিতেছে, রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে। আকন্দ তুলাখণ্ডগুলি দুই বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া, দুইটী স্বতন্ত্র অথচ অপরিহার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বায়ুস্রোত কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে তাড়িত হইতেছে। বালকের চক্ষের সমক্ষে এই তুলাখণ্ডগুলি যেরূপ, এই নবাবিষ্কারে, জ্যোতির্বিদ্‌দের চক্ষের সমক্ষে দৃশ্যমান বিশ্বের তারকা সমূহ সেইরূপভাবে প্রতিভাত হইতেছে। এই ভাসমান তুলাখণ্ডগুলির বিপরীত গতির কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বালক কিছুই চিন্তা করিত না, কেবল সরল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, হয়ত বা একটু আশ্চর্য্য হইত।

জ্যোতির্বিদেরাও বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, অধিকন্তু, কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও পাইতেছেন। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সমস্ত তারকা দুই বিশাল স্রোতে কেন বহমান? সকল তারকাই, আমাদের সূর্য্যও, একই উপাদানে গঠিত। দুই বিশাল তারকা স্রোতের বিপরীত-মুখী গতিতে যে পার্থক্য প্রকাশ করে তাহা তারাগণের অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য নহে; যাহা কর্ত্তৃক তারাগণ অনিবার্য্যরূপে সম্মুখদিকে বাহিত হইতেছে, তাহাতেই এ পার্থক্য। কিন্তু, সেই যে অনির্দ্দিষ্ট বস্তু, যাহা কোটী কোটী সূর্য্যকে অদৃশ্য স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—প্রবল স্রোতঃস্বিনী যেরূপে খড় কুটা ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার এই পার্থক্য উপাদান ঘটিত পার্থক্য নহে, এ কথাও সহেতুক। ইহা আকাশের এক বিশাল আবর্ত্ত, এক অপরিমেয় ঘূর্ণিপাক ইহার অপ্রতিহত শক্তি।

ইহা কি ঈথর? কিন্তু ঈথর ত অতৌল্য। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিরেট পদার্থের মধ্য দিয়াও ঈথর প্রবাহিত হয়, অথচ তাহাতে কোন পদার্থের ভৌতিক সংস্থানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। ঈথর যান্ত্রিক প্রণালীতে (mechanical) কার্য্য করে না। তাহা হইলে, ইহা স্রোতের মত করিয়া তারা সকলকে টানিয়া লইয়া যাইবে কি প্রকারে? যদি ঈথর না হইল তবে ইহা কি? ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের মধ্যে পরস্পরের যে আকর্ষণ শক্তি সে শক্তি তারকাপালের এইরূপ বেগে তাড়িত হইবার কারণ নহে; কেননা এই বিশাল স্রোতবেগ ছাড়া তারাগণের স্বতন্ত্র গতি আছে। আমাদের কল্পিত, বায়ুতরঙ্গ তাড়িত, আকন্দতুলা খণ্ডগুলিও এইরূপে নিজস্ব গতিতে চালিত হইতে পারে, অথচ তাহাতে তাহাদের দুই সাধারণ বিপরীতমুখী স্রোতগতির কোন ব্যাঘাৎ ঘটেনা।

এই সত্যটী, সমুদয় তারকা জগতের একত্বের যে একটা অনুভূতি মনে আনিয়া দেয়, তাহাতে মন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারাগণের রচনাপ্রণালীর ও উপাদানের অভিন্নতা, আকৃতির মোটামুটি একিই ভাব, বর্দ্ধনপ্রণালীর ও গুরুত্বের ভিন্নতা প্রভৃতির বিষয় সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা ছিল তাহাতে কখন মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয় নাই। অসীম আকাশে সমগ্র তারকা এক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিচালিত হইতেছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে একতার জ্ঞান কি সুন্দর-

রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ক্রমে ইহাও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে যে, এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতও পরস্পর সাপেক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, এ বিপুল বিশ্ব একতানে দোলায়মান হইতেছে। এ বিশ্ব এক বিরাট পরমাণু, এই পরমাণুর উপাদান—প্রত্যেক কণিকা গতির এমন এক নিয়মের অধীন যে সেই নিয়মসূত্রে সমগ্র বিরাট পরমাণুটী স্থায়ী একতানে বাঁধা রহিয়াছে। যে গুলিকে "পলাতক তারকা" নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিজস্ব গতি এত দ্রুত যে, অনুমান হয় যেন দৃশ্য জগৎ হইতে বহিষ্কৃত হওয়াই তাহাদের নিয়তি। ক্রিয়াশীল রশ্মি বিকীর্ণকারী (radio-active) রেডিয়ম্ ধাতু সদৃশ পদার্থের পরমাণু সকল হইতে যে কণিকাপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তাহার সহিত এই "পলাতক তারকা" দলের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

নিষ্কাম কর্ম্মই ধর্ম্ম।

সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া মানব যখন আত্ম-বিস্মৃত হয়, তখনই তাহার হৃদয়ে অমানিশার ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়। সে হৃদয়ে সে মুহূর্ত্তে আত্মার জ্যোতি প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শত দুঃখ শত বিপদ, শত বাধা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে হৃদয় অশান্তির রাজ্য হইয়া উঠে। ইহার কারণ কি? মানব আপনাকে ভুলিয়া যায় কেন? অনেক ধার্ম্মিকেরও যে এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

যে ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধন করেন তাঁহার এইরূপ দুর্ব্বলতা অতি বিরল। নিষ্কাম ধর্ম্ম অনেকে করেন বটে কিন্তু প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ অনেকেরই নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হয় না। এই নিষ্কাম কর্ম্মের অভাবই মানবের আত্ম-বিস্মৃতির কারণ।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ কি?—ফল-কামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য। আমরা স্বাধীন হইয়াও ঈশ্বরের নিকট পরাধীন। তাঁহারই আদেশে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে জড়ীভূত, সুতরাং যাহা কিছু করি তাহা তাঁহারই কর্ম্ম; অতএব কর্ম্মের ফল তাঁহাতেই অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্মে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাহাতে তাঁহার অবির্ভাব উপলব্ধি করতঃ কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন কার্য্য বটে, কিন্তু সাধনার বলে কিনা সিদ্ধ হয়। শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তাহা অতিক্রম করিয়া নিষ্কামী হওয়া চাই। কারণ মানব মাত্রই কর্ম্ম-লিপ্ত। যে গৃহী সে কর্ম্ম লিপ্ত; যিনি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী তিনিও কর্ম্ম-লিপ্ত। সুতরাং কর্ম্ম যখন মানবকে কখন ত্যাগ করিতে পারে না, তখন নিষ্কাম হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় কি। সেই নিষ্কাম কর্ম্মই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। তবে কি সংসার ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়-কার্য্য নয়? নিশ্চয়ই, সংসার-ধর্ম্ম পালন তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আমরা তাঁহারই সৃষ্ট প্রধান জীব। আমরা যখন আমাদিগের সর্ব্বস্ব তাঁহার বলিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া দিতে পারি, তখনই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। কিন্তু যখন আমরা তাহা না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হই তখনই আমাদের পতন হয় ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হই। হৃদয় দেবতাকে চিরকাল হৃদয়ে রাখিতে হইবে। তাঁহার দান—আমাদের প্রাণ-মন সকলি তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে। তবেই তাঁহার সেই অমৃত-চরণে অক্ষয় মুক্তি লাভ হইবে। শত বিপদের মধ্যে যাঁহার আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাই, যাঁহার অভয়-হস্ত দেখিতে পাই, সেই অন্তরতর অন্তরতম জগৎ-পিতার শরণ গ্রহণ কর। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও ভয়ত্রাতা। সংসারের সকল ক্ষেত্রে, সকল সুখ দুঃখ, বিপদ-সম্পদে তাঁহার চরণ ধরিয়া থাক। তিনি ভয়-বিপদের মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবেন। পুণ্যপথে তাঁহার দিকে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতি তাঁহার শত পদ-ক্ষেপ হৃদয়ে অনুভব কর। সেই শুভ-মুহূর্ত্তে কি সুখসূর্য্য তখন উদিত হইবে, যখন সংসারে থাকিয়াও আমরা সংসার ভুলিয়া যাইব। মৃত্যুতেও তখন কি আনন্দ। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই তাঁহাকে সম্যক প্রাপ্ত হই। হে জগৎ পিতা! আমাদের হৃদয়ে বল দাও। তোমার প্রতি আমাদিগকে আকর্ষণ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া আমাদের সকলি তোমাকে অর্পণ

করিতে পারি এবং তোমার আদেশ অনুসারে তোমারি ইঙ্গিতে এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধন করিতে পারি।

শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী।

নানা কথা।

শশকের চক্ষুদ্বারা অন্ধকে চক্ষুদান।—একটি যুবক তাহার নয় বৎসর বয়সের সময় অন্ধ হইয়া যায়। এক শশকের চক্ষুতারকার আবরণ লইয়া যুবকের চক্ষুতারকায় যোড়কলম (Grafting) করিয়া দেওয়াতে সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে; এই সংবাদে সকলের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই লোকটী অন্ধ অবস্থায় পনের বৎসর কাটাইয়াছে। এক প্রকার সাদা পদার্থ জন্মিয়া তাহার চক্ষুতারকাবরণের স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার লেসার বলেন, তিনমাস পরে এই যোড়কলম ঠিক জায়গায় লাগিয়া গেল, রোগী বার ইঞ্চি দূর হইতে আঙ্গুল গনিতে সক্ষম হইল। যুবকটী ক্রমে ক্রমে রং চিনিতে শিখিতেছে, বিনা সাহায্যে একাকী স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে। অস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রে, শশকের চক্ষুতারকাবরণ তুলিয়া রোপণ করিয়া দেওয়া অতি পুরাতন পদ্ধতি, কিন্তু ইহা তাদৃশ প্রচলিত নহে, এবং এরূপ ফলদায়ক হইতেও প্রায় কখন দেখা যায় নাই।

বহুমূত্র রোগে টক দুধ ব্যবস্থা—সর লৌডর ব্রান্টন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দুগ্ধাম্ল বীজাণু (Lactic acid germ) দ্বারা বহুমূত্র রোগকে পরাস্ত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ যেরূপ টক দুধ চিকিৎসার কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। তিনি বলেন টক দুধের মধ্যে ঘোলই উত্তম, ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ ও শরীর পোষণ করে; এবং ইহাতে একপ্রকার পোষণ পদার্থ আছে, যাহা শরীর কর্তৃক শোধিত হইলে, শরীরের অভ্যন্তরে চিনিকে দুগ্ধাম্লে (Lactic acid) পরিণত করিতে পারে। সর্ লৌডর আরও বলেন যে, মাকম তোলা দুধের দ্বারা সময়ে সময়ে যে উপকার পাইতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, মাকমতোলা দুধেতেও ঘোলের গুণ কিছু কিছু আছে। কিন্তু ঘোলই অধিক ফলদায়ক। নিম্নোক্ত প্রণালীতে ঘোল সেবন এই ডাক্তারের ব্যবস্থা:—একটা বড় পাত্র ভরিয়া ঘোল রাখিবে, দিন কয়েক সেবনের পর যতটা ঘোল কমিয়া যাইবে ততটা টাট্‌কা ঘোল দ্বারা সেই পাত্র আবার পূর্ণ করিয়া দিবে। ঘোলের পাত্র ধুইবে না, বাসি টক ঘোলেতে টাট্‌কা ঘোল মিশিলে টাট্‌কা ঘোলে অম্লের সঞ্চার শীঘ্রই হয়।

ম্যালেরিয়ার নবীনতম চিকিৎসা।—বিদেশী নিদান শাস্ত্র সভাতে Société de pathologie Exotique) মং কুটো বলিয়াছেন যে, একপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে মিথিলীন নীল (Methylene blue) দ্বারা শিরাভ্যন্তরে পিচ্‌কারি দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। যে সমস্ত ম্যালেরিয়া রোগী কুইনিনেতে কিছুমাত্র ফল পায় নাই তাহারা এই নূতন ঔষধে সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়াছে; ইউরোট্রোপাইন বা সালোলের (Urotropine or salol) সহিত মিশ্রিত করিয়া ৫০ সান্টিগ্রাম (Centigrammes) দেওয়া দৈনিক ব্যবস্থা। মং কুটোর বিবেচনায়, অচৈতন্য বা তড়্‌ক সংযুক্ত বিষম ম্যালেরিয়াতে, দিনের মধ্যে বারবার মিথিলীন নীলের পিচকারী শিরাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

সর্পবিষ নিবারক নূতন রস।—বার্লিন নগরের জলচিকিৎসা প্রতিষ্ঠার সহকারী ডাক্তার ক্রাউস্ সাহেব সর্পদংশন বিষ নিবারণের এক নূতন রস আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহা সকল প্রকার সর্পের বিষনাশে সমান কার্য্যকারী। এই নূতন ঔষধের কার্য্যকারিতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা শীঘ্রই সর্পবহুল দেশসমূহে প্রেরিত হইবে।

পাকস্থলীর ফোটো তোলা:—মিউনিক নগরের একজন চিকিৎসক একটি অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্বারা পাকস্থলীর অভ্যন্তর দেশের সুস্পষ্ট ফোটো তোলা যাইতে পারে। রোগীর ক্যামেরাটাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে হয়, পরে ক্যামেরা গম্যস্থানে পৌঁছিলে ক্যামেরা সংলগ্ন ছোট ইলেক্ট্রিক্ ল্যাম্প দ্বারা পাকস্থলীর অভ্যন্তর দেশ আলোকিত করা হয়। ২০ ইঞ্চি লম্বা সিকি ইঞ্চি চওড়া ফোটোগ্রাফের ঝিল্লী (film) ক্যামেরার তলদেশে গুটান থাকে। চিকিৎসক সুতাগাছা ধরিয়া টানিলে ঐ ঝিল্লী লেন্সের (lens) উপর প্রসারিত হইয়া পড়ে ও ইলেক্ট্রিক্ ল্যাম্প জ্বালান হইলে তৎক্ষণাৎ ঝিল্লীপটে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। আবশ্যকীয় সংখ্যক ছবি যতক্ষণ তোলা না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ এই প্রণালীতে কার্য্য চলিতে থাকে।

নূতন ধরণের আতস বাজি।—ইহা কেবলমাত্র নয়ন-রঞ্জক পদার্থ নহে, ইহা স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস উচ্চারণে সক্ষম; এই বিবরটি, প্রবন্ধপাঠ দ্বারা, ফরাসী বিজ্ঞান সভায় (French academy of Sciences) বিশেষরূপে জ্ঞাপন করা হয়। এই নূতন প্রণালীর

আবিষ্কারকেরা তিনবৎসর যাবৎ এই চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন স্ফোরক (explosive) পদার্থ-দ্বারা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা একটা "রেলরোড" টোটা প্রস্তুত করিয়াছেন সেটা বলিয়া ওঠে "থাম"! আর একটা ১৪ই জুলাই দিনের জন্য, প্রস্তুত করিয়াছেন; সেটা চেঁচাইতে থাকে "সাধারণ তন্ত্র চিরজীবী হোক্" (Vive la Republique)

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

(Science Siftings)

মহর্ষি।

মহর্ষি দেবের সহিত আমার প্রথম সম্বন্ধের কথা মনে হইলে সর্ব্বপ্রথমে, অথর্ব্ব বেদের 'যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি' শ্লোকটির কথা মনে পড়ে। আদি-ব্রহ্মসমাজের বেদী হইতে বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মুখে ইহা ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়াছিলাম। সেই দেব বাণী ধীরে ধীরে তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহিত করিয়া দিল। তৎকালে আমার চক্ষু দিয়া অবিরাম প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছিল। ফলতঃ আমি কোথায় আছি তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একরস আনন্দে আমি বিভোর। ব্যাখ্যান অবসানে, প্রাচীন গায়ক বিষ্ণুবাবুর গান শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরে আমি আমাদের হুগলির ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম। ট্রেন চলিয়াছে কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান চলিতেছে। রাত্রে আহার করিতেছি, ঐ ব্যাখ্যান আমার হৃদয়ে জাগিতেছে; মনে আনন্দ আর ধরে না। এই অবস্থায় রাত্রি অবসান হইল। আমি প্রত্যাহিক নিয়মানুসারে উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরম পিতার মহিমা গানে প্রবৃত্ত হইলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, দেখি মহর্ষি-দেবের সৌম্যমূর্ত্তি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান। আমি তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তানপুরা যোগে মহেশের নামগান করিলাম। পরে ছয়টার সময় গঙ্গাতীরে প্রাতঃকালীন বায়ু সেবনে বাহির হইলাম। বেলা সাতটার সময়-প্রত্যাগমন কালে দেখি একখানি বজরা-হুগলী এমাম-বাড়ীর নিকট উপস্থিত। একজন পলিত-কেশ বৃদ্ধ উহার ছাদের উপর চৌকিতে উপবিষ্ট। পরে বুঝিলাম, আমি পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহার বক্তৃতা আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রবণ করিয়া ছিলাম, তিনিই আজ আমার সম্মুখে। অবিলম্বে বাটী ফিরিয়া গিয়া আমার হারমোনিয়ম ও কয়েক খানি গানের কাগজ লইয়া একখানি নৌকাযোগে তাঁহার বজরায় উঠিলাম এবং ছাতের উপর গিয়া প্রণামান্তে মুক্ত-কণ্ঠে পূর্ব্ব-রাত্রের প্রদত্ত উপদেশ যতদূর স্মরণ ছিল উৎসাহের সহিত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলাম। তিনি দূরদেশে গঙ্গা-বক্ষে ঐ ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া গেলেন, এবং আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক"। আরও বলিলেন আমার বিশ্বাস ছিল, আদি-ব্রাহ্ম সমাজে আজকাল শ্রদ্ধাবান লোক আসে না, যে সব লোক আসে, তাহারা ভাসা ভাসা। কিন্তু এই দূরদেশে অমৃতের বার্ত্তা শুনিয়া আমার সে বিশ্বাস অপসারিত হইল। আমি দেখিতেছি শ্রদ্ধাবান প্রেমিক ভক্ত লোকও আসিয়া থাকেন। তদুত্তরে আমি বলিলাম আমি বহুদিন হইতে আদি-সমাজের নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিয়া আসিতেছি, তথায় অনেক ভক্ত লোক দেখিতে পাই যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিয়া ও সঙ্গীত শুনিয়া মনে অপার আনন্দ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আরও বলিলাম এক সময় আমি সমাজ-মন্দিরে কয়েকটি কাশী বাসী পণ্ডিত দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদিগকে আদরের সহিত আসনে উপবেশন করিতে বলায়, তাঁহারা প্রথমেই বলিলেন, "ও মাহাত্মা ধন্য হায়, যেননে এই ধর্ম্ম-সভা রচনা কিয়া, এই রাজধানীকা বিচমে, বিষয়কা প্রবল স্রোত বহতা হায়, শান্তিকা ও আরামকা স্থান একো না নজর পড়া।" তাঁহারা উপাসনা ও সঙ্গীত শেষে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীন গায়ক বিষ্ণুবাবুর সহিত—'গাওরে জগৎপতি জগবন্দন, ব্রহ্মসনাতন পাতক-নাশন' এই সঙ্গীতে যোগ দিয়া ধন্য হইলেন। ক্রমে আমি কয়েকটি সঙ্গীত হারমোনিয়ম যোগে তাঁহাকে শুনাইলাম। ক্রমে বজরা ত্রিবেণীর ঘাটে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি ভাবে বিভোর। অনেকক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আসিয়াছি? আমি বলিলাম, ঐ ত্রিবেণীর ঘাট দেখা যাইতেছে। তিনি বজরা ফিরাইতে আদেশ দিলেন। তখন বেলা দশটা। তাঁহার ভৃত্য একখানি রূপার প্লেটে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন মহর্ষির হস্তে আনিয়া দিল। তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ অন্য একটি রেকাব আনাইয়া আনন্দের সহিত আমাকে দিলেন। আমি তাঁহার নিজহস্ত প্রদত্ত দেব-প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম।

সে আজ বত্রিশ বৎসরের কথা। তাঁহার সহিত এই প্রথম সম্মিলন এখনও আমার অন্তরে সজীব ভাবে জাগিতেছে। এই প্রেমের সম্বন্ধ আমার প্রতি তিনি চিরজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমার যে কিছু কর্ত্তব্য পরায়ণতা সৎকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহ, ধ্রুব সত্যে নির্ভর, তাঁহার মহিমাগানে প্রবৃত্তি। এ সকলই তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ।

মহর্ষি দেবের বরণীয় মূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে আমাদের দেশের অমর কবির এই শ্লোকটি মনে উদিত হয়।

শ্মশান-ঘাটে ঠাকুরমার অন্তিমকালে বৈরাগ্যের

উদ্যোগ-পর্ব্ব মহর্ষি যে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শান্তি-পর্ব্বে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে এই অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছি, যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হইতে চায়, সে ধর্ম্মের বিমল আনন্দ লইয়া থাকুক। বিবেক বৈরাগ্য ও সদ্ভাব পূর্ণ কত সংগীত ও বক্তৃতা তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে সহজে বহির্গত হইয়া কত শত নিরাশ অন্তরে কত যে অপার শান্তি প্রবাহিত করিয়াছে, কে তাহার পরিমান করিবে।

শ্রীলালবিহারী বড়াল।

১লা ডিসেম্বর তারিখের—The Indian Daily news পত্রে প্রকাশ গরগাঁও জেলার অন্তর্গত রেওয়ারি নামক স্থানের জনৈক উকীল অপুত্রক অবস্থায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পত্নী জীবিত। উকীল বাবু তাঁহার অর্জ্জিত প্রায় ষাট হাজার টা০। দয়ানন্দ এংগ্লো ভেদিক কালেজে (anglo-vedic college) অর্পণ করিয়াছেন। যতদিন তাঁহার বিধবা পত্নী জীবিতা থাকিবেন, ততদিন তিনি পোনের হাজার টাকার সুদ পাইবেন এই মাত্র। এরূপ দান নিতান্ত বিস্ময়কর বলিতে হইবে। উকীল বাবুর নাম সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। হায় আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কবে এরূপ লোকের অভ্যুদয় হইবে।

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ।—বিগত ৩০এ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ৫৫তম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ শিরোমণি ও চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায় পারায়ণের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যার পরে সমাজমন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইলে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, ও সম্পাদক কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সঙ্গীত শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রে শ্রোতার সংখ্যা ৪।৫ শত হইবে।

কুশদহ।—গোবরডাঙ্গা অঞ্চল হইতে "কুশদহ' নামক একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু উহার সম্পাদক। আমরা যোগীন্দ্র বাবুকে পূর্ব্ব হইতে চিনি। তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ ও সাধক। প্রাগুক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রস্তাব গুলি মন্দ হয় নাই।

জগজ্জ্যোতিঃ।—কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে মহাস্থবির কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে ঐ নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের নিকট অনেকগুলি বৌদ্ধ বাস করেন। বঙ্গভাষায় এইখানি বৌদ্ধদিগের মুখপত্র। ইহাতে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। আমরা এই পত্রের উন্নতি কামনা করি।

উপদেশ—পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ২রা নবেম্বর "দেবালয়ে' যে উপদেশ দেন তাহা তত্ত্বকৌমুদীর ১৬ই অগ্রাহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "ত্যাগই আমাদের ধর্ম্ম, ত্যাগই আমাদের সমাজ, ত্যাগই আমাদের একতা; এবং আমাদের আলয় ও আশ্রয়।" শাস্ত্রীজির একথাটি আমাদের বড়ই সুমিষ্ট লাগিল।

সহ সং।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৮৬ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
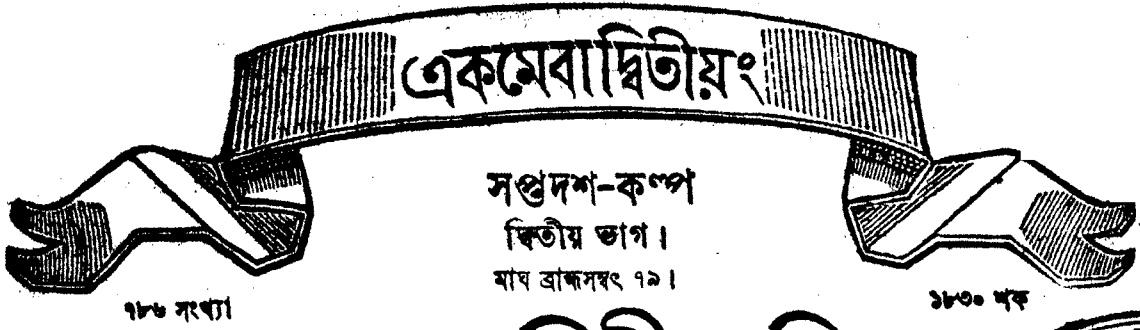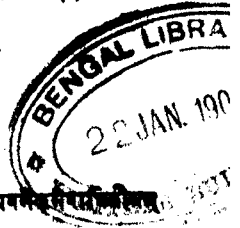
বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বিশ্বাসের আলোকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই শান্তিনিকেতনের তপস্যাশ্রম, বিদ্যামন্দির, ছাত্রনিবাস, ইহার নয়নরঞ্জন বাহ্য-দৃশ্য-শোভা, উৎসব সংক্রান্ত সুগম্ভীর উপাসনা উপদেশ, সুশ্রাব্য গীত বাদ্য, তৎসঙ্গে লোকসমারোহ, আনন্দমেলা, যাত্রাভিনয় আতসবাজী এবং পান ভোজন, সজ্জন সম্মিলন প্রভৃতি ব্যাপার, সর্ব্বোপরি এখানকার সুবিমল সমীরণ, প্রমুক্ত প্রান্তর, সুনীল অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডপতি পরম দেবতার এক অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জনসমাগম এবং আনন্দ কোলাহল অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার বাহ্য ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার শান্ত গম্ভীর আবির্ভাব এবং জীবন্ত প্রভাব এখানে চির বর্ত্তমান। কিন্তু কিসের জন্য এ সমস্ত বিপুল আয়োজন, এই লোক সংগ্রহ? এক অখণ্ড অদ্বিতীয় চিন্ময় পরব্রহ্মের দিকে কি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নহে?

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মপরিচয় এবং ব্রহ্মসাধনে অনুরাগ উদ্দীপন জন্যই এই আশ্রমের ও উৎসবের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শত সহস্র দর্শক ও যাত্রী দলের মধ্যে যদি একটী মনুষ্যও মহর্ষিদেবের উপরিউক্ত শুভ অভিপ্রায়টী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অমর যোগজীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তিনি নিশ্চয়ই দেবগণের পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত হইবেন। সারদর্শী সাধক এ স্থানের যাবতীয় দৃশ্যমান অনিত্য ঘটনা পুঞ্জের এবং নয়নমনোহর বাহ্য ব্যাপারের অন্তরালে সেই সর্ব্বগত নিত্য নির্ব্বিকার—পরম সুন্দর পুরুষ ও তাঁহার প্রেরিত মহর্ষির আধ্যাত্মিক দেবজীবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন সন্দেহ নাই।

হে শান্তিনিকেতনের যাত্রী! যখন আসিয়াছ, কিছু নিত্য সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও। স্থান মাহাত্ম্যটা বুঝিয়া দেখ। সত্য সত্যই কি তোমরা শূন্য প্রাণে গৃহে

ফিরিয়া যাইবে ? মহর্ষির ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করিবে না ? তিনি বলিতেছেন, “বৎস এস, আমার সঙ্গে সপ্তপর্ণ-বৃক্ষমূলে আসিয়া ঐ যোগাসনে উপবিষ্ট হও এবং মুদ্রিত নয়নে শান্ত চিত্তে বল, “ওঁ শান্তম্‌শিবমদ্বৈতম্‌”। তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সুদূরপ্রসারিত মহা প্রান্তর, উহার এক প্রান্ত হইতে প্রাতে রক্তিমরাগরঞ্জিত নব রবি আকাশে উঠিয়া অপর প্রান্তে অস্ত যায়। ঊর্দ্ধ নেত্রে অনন্তে নীলাম্বরের প্রতি চাহিয়া দেখ, কি নয়নস্নিগ্ধকর অখণ্ড প্রগাঢ় নীলিমা। যেন স্থির ধীর নিস্তরঙ্গ বিশাল জলধি। এখানকার প্রশান্ত ভাব সুকোমল বক্ষ জননীর ন্যায় স্নেহালিঙ্গন পাশে চাপিয়া ধরিবার জন্য চারিধার হইতে যেন তোমা পানে নামিয়া আসিতেছে। কি আরাম, কি শান্তি! মৃদু মারুত হিল্লোলের সুখস্পর্শে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল, হৃদয় শীতল হইল। এই প্রমুক্ত প্রান্তরের প্রমুক্ত বায়ু এই প্রমুক্ত আকাশ, ইহারা অনন্তের প্রেরিত দূত; সাধককে অনন্তের বার্তা আনিয়া দিতেছে। এমন পবিত্র সহবাসে বসিয়া কেবলই বল, ওঁ। ওঁকার নাদে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া একাগ্র চিত্তে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও।

বাহিরের নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া গীত বাদ্য শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলে, চক্ষু কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিলে। আর এই আকাশ, এই অন্তরীক্ষ, এই প্রান্তর, ইহারা কি কিছুই নহে? যদি কিছুই নয়, তবে ইহাদের দর্শনে স্পর্শনে কেন প্রাণ উদাস হয়, হৃদয় অনন্তের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়? যোগীরা কিরূপে ধ্যান ধারণা করেন? উত্তরে কথিত হইয়াছে,

> “ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃ পূর্ণং যদাত্মকম্‌,
> সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধি স্তস্য লক্ষণম্‌।”

ঈদৃশ সমাধি সাধনের প্রধান অবলম্বন এই চতুঃপার্শ্বস্থ মহা আকাশ।

এই প্রমুক্ত আকাশ, প্রমুক্ত প্রান্তর দেখিতে মনে হয় যেন কেবলই শূন্য, কিন্তু ইহাই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের ছায়া।

এই প্রমুক্ত আকাশতলে বসিলে, আমরা কত যে ক্ষুদ্র তাহা বেশ বুঝিতে পারি। হায়, এই অনন্তের সর্ব্বগ্রাসী মহাসত্তার অতলস্পর্শ গভীর অভ্যন্তরে আত্মহারা হইবার জন্য যোগীরা কত লালায়িত!

বিচিত্র গুণের আধার, অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত সুন্দর, মহৈশ্বর্য্যশালী লীলাময় ব্রহ্মে আমরা আত্মহারা হইতে চাহিনা, তাঁহার প্রেমমাধুর্য্যরসে তলাইয়া যাইতে ভয় পাই, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক পদার্থে, রূপ রস শব্দ গন্ধে আপনাকে অনায়াসে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহাদের মোহে মজিয়া রহিয়াছি। বহির্জগতের দৃশ্যমান ঘটনাতরঙ্গের মধ্যেও সেই পরম পুরুষের নিত্য নব নব বিকাশ এবং আবির্ভাব, কিন্তু অন্তর্ভেদী বিজ্ঞানদৃষ্টির অভাবে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। হায়, কবে আমরা বিশ্বাসনয়নে অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইব!

আমাদের ধ্যেয় উপাস্য পরমাত্মা নির্গুণ, অব্যবহার্য্য একটি সংজ্ঞা মাত্র নহেন, তিনি শরণাগত বৎসল। গভীর ধ্যানযোগে তাঁহার সত্তাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলারও তুল্য শান্তি আর কিছুতে নাই। সে ক্রোড়ে প্রবেশ করিতে পারিলে কিসের ভয়, কিসের ভাবনা। এই খানেই সকল কামনার পরিসমাপ্তি, এইখানেই জীবনের সকল প্রশ্নের মীমাংসা, সাধকের পরমপুরুষার্থসিদ্ধি। অতএব নিরাকার সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রাপ্তির পক্ষে এখানকার এই অনন্তের

আকাশ আমাদের প্রধান উপকরণ, চিদাকাশ স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার ইহাই সিংহদ্বার।

হে অনন্তদেব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, তোমার নিকট আর কি চাহিব? চাহিবার অগ্রেইত সকলই তুমি দিয়াছ। তুমি স্বয়ং আপনাকে দিয়া জীবের সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছ। আকাশ যেমন সর্ব্বগত ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তুমি আকাশের আকাশ,সূক্ষ্ম আকাশ, মহাকাশ, চিদাকাশ, আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। শিশু মায়ের কোলে থাকিয়াও যেমন বার বার আদর করিয়া প্রেমভরে মা মা বলিয়া ডাকে, কোন অভাব না থাকিলেও মা বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসে, তেমনি তোমার স্নেহকোলে বসিয়া আমরাতোমাকে ডাকিতেছি। তুমি বাহিরের ভৌতিক আবরণে আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিও না, অব্যবধানে দেখা দিয়া, স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া আমাদিগকে তোমার করিয়া লও।

উপনিষদে আত্মজ্ঞান।

বৈদিক সময়ের ঋষিরা ঈশ্বরকে কেবল বাহ্য বিষয়ে দেখিতেন, উপনিষদের সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে আত্মাতে অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আত্মজ্ঞান হইতে পরমাত্মজ্ঞান অর্জ্জন করিলেন। পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মাতে দেখ, ইহা উপনিষদের উপদেশ। উপনিষদ বলিতেছেন—

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং—

যে সকল ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তির তাহা কদাপি হয় না।

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগস্থাপন, ইহাই উপনিষদের মূলতত্ত্ব এবং নানা উপদেশ ও আখ্যায়িকা সূত্রে তদ্বিষয়ক শিক্ষাদান উহার চরম উদ্দেশ্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আত্মজ্ঞান বিষয়ক একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বিরোচন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত হইবার পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেন তোমরা এখানে আসিয়া বাস করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন

য আত্মা ঽপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু র্বিশোকো ঽবিজিঘৎসো ঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

যে আত্মা পাপশূন্য অজর অমর অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক, আমরা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি—সেই আত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রজাপতি একেবারে সমস্তটা খুলিয়া বলিতে চাহেন না, এজন্য দ্ব্যর্থ ভাবাপন্ন দু-একটা কথা বলিয়া উপদেশ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বলিলেন—

ঐ যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষের আকৃতি দেখিতেছ—ওই যে অক্ষিপুরুষ ওই সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন জলে যাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, দর্পণে যে মূর্ত্তি দর্শন করা যায়, সে কে?

প্রজাপতি উত্তর করিলেন এই সেই আত্মা বটে। জলপূর্ণ পাত্রে একবার

তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন কর—দেখিয়া যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে বলিও।

তাঁহারা জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন—তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ ?

তাঁহারা বলিলেন, আমরা উভয়ের সমস্ত দেহের অবিকল প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি—নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব দেখা যাইতেছে।

প্রজাপতি কহিলেন,

তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, পুনর্ব্বার দেখ কি দেখা যায় ?

তাঁহারা সেইরূপ করিয়া বলিলেন আমরা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেমন তেমনি দেখিতে পাইতেছি।

প্রজাপতি বলিলেন "ওই যা দেখিতেছ—ওই সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।"

বিরোচন ঐ কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অসুরদের নিকট ফিরিয়া গেলেন, আর জড়াতিরিক্ত চৈতন্য নাই, এই ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া দিলেন—ইহাতেই তাহাদের অধোগতি হইল। যাহারা এই মতের অনুগামী তাহারা দেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া বিষয় সুখে মত্ত থাকে। যাহারা এখানে দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম করে না—ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা এই আসুরিক ব্যবহারের জন্য অসুর নামে খ্যাত। অসুরেরা ক্ষণবিধ্বংসী শরীরকে আত্মা ভাবিয়া মৃত দেহকে গন্ধমাল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া আপনাদিগকে ভুবনবিজয়ী জ্ঞান করিয়া থাকে।

প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্তি—এতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে

কিন্তু ইন্দ্র এ উপদেশে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন—"জলের মধ্যে দেহের যে পরিষ্কার সুন্দর ছবি পড়িয়াছে সে যদি আত্মা হয় তবে অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ দেখিতে হইবে—খঞ্জ হইলেও আত্মা ঐ রূপ হইবে এবং দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনষ্ট হইবে। অতএব এ উপদেশ কোন কার্য্যেরই নহে।" তিনি সমিৎ হস্তে পুনর্ব্বার প্রজাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপনার সংশয় জানাইলেন।

প্রজাপতি বলিলেন যা বলিতেছ ঠিক কথা—আর ৩২ বৎসর আমার নিকট বাস কর তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এইরূপে আরো ৩২ বৎসর অতীত হইলে প্রজাপতি বলিলেন—

স্বপ্নে যিনি সুখে বিচরণ করেন তিনি আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। তিনি ভাবিলেন "সত্য বটে এ অবস্থায় আত্মা দেহের ব্যথায় ব্যথিত হয় না তবুও স্বপ্নেতে ভয় হয় কে যেন আমাকে তাড়না করিতেছে—কে আমাকে পীড়ন করিতেছে, সে সময়ে কষ্টে অভিভূত হইয়া স্বপ্নাত্মা ক্রন্দন করিতে থাকে। অথচ প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে আত্মা অভয়—অজর অমর অশোক—তাহা কি প্রকার ?

এই সকল ভাবিয়া ইন্দ্র প্রকৃত আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি পুনরায় তাহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবার উপদেশ দিলেন। সেই কাল অতীত হইলে ইন্দ্রকে বলিলেন—

সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্য কখন কোন স্বপ্ন দেখে না—সম্পূর্ণ শান্তির অবস্থায় থাকে—সেই আনন্দময় অবস্থা যার সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

ইহাতেও ইন্দ্রের সংশয় মিটিল না। তিনি ভাবিলেন—এ অবস্থায় আত্মা আপনাকে আপনি জানে না। আর বাহিরের কোন বস্তুকেও জানিতে পারে না। এ বিনাশের অবস্থা। অথচ প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে আত্মা অমৃত—ইহার বিনাশ নাই। অতএব এ উপদেশও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সমিৎহস্তে পুনর্ব্বার তিনি প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন। গিয়া গুরুর আদেশ মত আবার ৫ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যে শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইল। তৎপরে প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া রীতিমত আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেন। হে মঘবন্, এই দেহ নশ্বর, মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়; যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন তিনি আত্মা, মন দিব্য চক্ষু স্বরূপ; আত্মাই এই নানারূপ দিব্য চক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমন করেন। আত্মা যত দিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহ পাশে বদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হন কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আত্তো বৈ স শরীরঃ প্রিয়া প্রিয়াভ্যাং নবৈ সশরীরস্য
সতঃ প্রিয়া প্রিয়য়ো রপ হতিরস্তি
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া প্রয়েস্পৃশতঃ

যেমন অশরীরী বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতি পরমাত্মাকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখন তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন দিব্যজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া—দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পরম শান্তি —পরমারোগ্য উপভোগ করেন।”

প্রজাপতির এই উপদেশ, সমস্ত উপনিষদেরও এই সারমর্ম্ম। বৈদিক ঋষিরা একজে বহুরূপে প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রকাশিত দেখিয়া পূজা করিতেন

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজো
ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ—তাঁহার আবির্ভাব তাঁহারা ভূলোকে দ্যুলোকে আকাশে অন্তরীক্ষে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু মেঘ বিদ্যুতে প্রত্যক্ষ করিতেন। উপনিষদের আচার্য্যেরা বহু হইতে একে পৌঁছিয়া সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

যে তেজোময় অমৃতময় অন্তর্য্যামী পুরুষ আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়.

তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। যখন সাধক জানিতে পারেন যে “যিনি অসীম আকাশের অধিদেবতা সর্ব্বজগতের মূলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণব্রহ্ম,

তিনি আমার আত্মার অধিদেবতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা”—তখন তাঁহাতে আত্মসমাধান করেন=তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

সমোদতে মোদনীয়ং হিলব্ধা

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

তৃতীয় উপদেশের

অনুবৃত্তি।

পূর্ব্বোক্ত নীতিবাদের ন্যায় আমরা আর একটি নীতিবাদের উল্লেখ করিব যাহা মিথ্যা নহে কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রয়োজনবাদ ও সুখবাদের পক্ষপাতিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে একটু ব্যাপক করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সুখই মঙ্গল,—সুখ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; তাঁহারা বলেন, আত্ম সুখবাদীরা ব্যক্তিগত সুখকে সুখ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন; আসলে সাধারণের সুখকেই সুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একথা আমরা স্বীকার করি যে, এই নূতন সিদ্ধান্তটি, ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের বিরোধী; কেন না ঐ নীতিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তি শুধু যে একটা ক্ষণিকভাবের ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে তাহা নহে, পরন্তু অবস্থা বিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

তথাপি, এই সিদ্ধান্তটি, প্রকৃত নীতি হইতে—সমগ্র নীতি হইতে দূরে অবস্থিত।

সাধারণ-স্বার্থবাদ, নিঃস্বার্থপরতায় লইয়া যায়;—অবশ্য ইহা অনেকটা ভাল; কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা মঙ্গলের একটা উপাধিমাত্র (Condition), স্বয়ং মঙ্গল নহে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও কোন একটা ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে। কোন এক কার্য্যে, কার্য্যকারী ব্যক্তির কোন লাভ নাই বলিয়াই যে সেই কার্য্য অন্যায় হইবে না, একথা বলা যায় না। সর্ব্বাগ্রে সাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন কাজ করিলে, যাহাকে বলে অহংপরতা—সেই অহংপরতা-পাপে কোন ব্যক্তি লিপ্ত না হইলেও অন্যান্য বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইতে পারে। ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, সাধারণের স্বার্থ সকল সময়েই ন্যায়-ধর্ম্মের অনুমোদিত; আসলে সাধারণের স্বার্থ ও ন্যায়ধর্ম্ম—এই দুইটি জিনিস এক নহে। যদিও অনেক সময়ে এই দুইটি এক সঙ্গে যায়, তবু কখন-কখন উহারা পৃথক্‌ভাবেও কাজ করে। অ্যাথেন্‌সের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য, থেমিস্টক্লিস্ অ্যাথেন্‌স্-বন্দরের মৈত্রীবদ্ধ প্রদেশ-সমূহের নৌ-বহর অগ্নিসাৎ করিবার প্রস্তাব করেন;—কিন্তু অ্যারিস্টাইডিস্ বলেন, প্রস্তাবটি সুবিধাজনক বটে, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ; এই কথায়, অ্যাথেনীয়েরা এই অন্যায় সুবিধাটি পরিত্যাগ করিল। তবেই দেখ, এ বিষয়ে থেমিস্টক্লিসের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না; দেশের স্বার্থের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। যদি তিনি বলপূর্ব্বক এই সমস্ত কাজ এথেনীয়দিগের দ্বারা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন এবং

সেই জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে, যে কাজ আসলে অন্যায় তাহার জন্য অতীব শ্লাঘ্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইত।

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, এই দৃষ্টান্তে যদি স্বার্থ ও ন্যায়ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী হইয়া থাকে, তাহার কারণ, এই-স্থলে স্বার্থ যথেষ্টরূপে সাধারণের স্বার্থ হয় নাই বলিয়া; এইরূপ স্থলে,—"পরিবারের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন করিবে, নগরের জন্য পরিবারকে বিসর্জ্জন করিবে, দেশের জন্য নগরকে বিসর্জ্জন করিবে, বিশ্বমানবের জন্য দেশকে বিসর্জ্জন করিবে—এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

তুমি যদি অতদূর পর্যন্তও যাও, তবু দেখিবে ন্যায়ধর্ম্মের ধারণায় তুমি উপনীত হইতে পার নাই। বিশ্বমানবের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ন্যায়ধর্ম্মের সহিত যে মিল হইতে পারে না, এরূপ নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে উহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া, ঐ দুই জিনিস এক নহে; তাই, এরূপ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, বিশ্বমানবের স্বার্থ ন্যায়ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত। যদি শুধু একটা দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হয় যে, স্থল-বিশেষে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত প্রকৃত মঙ্গলের ঐক্য হয় নাই, তাহা হইলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সাধারণের স্বার্থ ও প্রকৃত মঙ্গল এক জিনিস নহে।

তুমি উপদেশ দিতেছ যে, সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু কাহার দোহাই দিয়া তুমি এইরূপ উপদেশ দেও? শুধু কি স্বার্থের দোহাই দিয়া? যদি স্বার্থ বলিয়াই স্বার্থের কথা শুনিতে আমি বাধ্য হই, তবে আমার নিজ স্বার্থের কথা আমি কেন না শুনিব? অন্যের স্বার্থের জন্য আমার নিজের স্বার্থকে কেন বিসর্জ্জন করিব তাহার ত কোন সুসঙ্গত হেতু দেখিতে পাই না।

তুমি বলিতেছ, সুখই মানব-জবিনের পরম লক্ষ্য। ইহা হইতে ন্যায্যরূপে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আমার সুখই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য।

যদি তুমি আমাকে আমার সুখ বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দেও, তাহা হইলে সুখ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া তোমার এই উপদেশ দিতে হইবে।

অধিকাংশলোকের স্বার্থই পরম স্বার্থ,—এই প্রসিদ্ধ মূলসূত্র অনুসারে চলিলে, কি বিপদেই পড়িতে হয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। প্রথমত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আমার প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করাই কঠিন; তার পর দেখ, ন্যায়ধর্ম্মের অভ্রান্ত আদেশের স্থানে, ব্যক্তিগত স্বার্থের অনিশ্চিত গণনাকে দাঁড় করাইয়া তুমি এই কঠিনতার কিছুমাত্র লাঘব করিলে না। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি আমার নিজের স্বার্থ নির্ণয় করিতে হয়—শুধু নিজের স্বার্থ নয়, আমার পরিবারের স্বার্থ,—শুধু পরিবারের স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থ, শুধু দেশের স্বার্থ নয়—বিশ্বমানবের স্বার্থ আমাকে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কি! আমার দূরদৃষ্টিকে সমস্ত জগতের উপর প্রসারিত করিতে হইবে? এইরূপ কঠিন পণে আমাকে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইবে? তাহা হইলে এমন একটা জ্ঞান তুমি আমার উপর আরোপ করিতেছ যাহা শুধু ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয়ের উদ্দেশে ঠিক্ পথে আপনাকে

পরিচালন করিতে হইলে, দর্শনের ইতিহাস কিংবা কূট নীতি-বিদ্যাও যথেষ্ট নহে। মনে রাখিও, মানব-জীবনের কোন গণিত-সিদ্ধ বিজ্ঞান নাই। তোমার গণনা যতই গভীর হউক না, তোমার ভাগ্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক না, দৈব-ঘটনা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আসিয়া, তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে,—তোমার দুঃখ যতই নৈরাশ্যজনক হউক না তাহা হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে, সুখ ও দুঃখকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবে—তোমার দূর-দৃষ্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

এইরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপর তুমি ধর্ম্মনীতিকে স্থাপন করিতে চাহ? দেখ, এই প্রহেলিকাবৎ সাধারণ-স্বার্থকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা কতই কুতর্ক অবলম্বন করিয়া থাকি! আমার কোন বন্ধুর দৈন্য-দশা উপস্থিত হইলে, আমি সহজেই সাধারণ স্বার্থঘটিত এমন একটা দূর সম্পর্কের হেতু বাহির করিতে পারি যাহার দোহাই দিয়া আমি আমার বন্ধুর সাহায্যে হয়-ত বিরত হইব। এই ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আমার নিকটে অর্থ যাচ্ঞা করিতেছে; কিন্তু ঐ অর্থ যদি আমি বিশ্বমানবের কাজে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার ঐ অর্থব্যয় কি আরও সার্থক হইবে না? কল্য ঐ অর্থ কি আমার দেশের জন্য আবশ্যক হইবে না? অতএব উহা আপাতত ব্যয় না করাই ভাল। তাছাড়া এই স্থলে সাধারণের স্বার্থ সুস্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি হইলেও ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে;—এইরূপ নানা প্রকার মিথ্যা জল্পনা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিবে। কোন ভাল কাজ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে যদি ইহাই দেখিতে হয়, উহা অধিকতম লোকের পরম স্বার্থ কি না, তাহাহইলে এরূপ কাজ দুঃসাহসী ও উন্মাদ-গ্রস্ত লোক ভিন্ন আর কেহ করিতে সাহস পাইবে না। স্বীকার করি, সাধারণ-স্বার্থের ধারণা হইতে উদার আত্মোৎসর্গ প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক মহাপরাধও প্রশ্রয় পাইতে পারে। ঐ সাধারণ-স্বার্থের দোহাই দিয়া, সর্ব্বপ্রকার উন্মত্ত ব্যক্তিরা—ধর্ম্মোন্মত্ত, স্বাধীনতা-উন্মত্ত, দর্শনশাস্ত্র-উন্মত্ত ব্যক্তিরা—বিশ্ব-মানবের পরম স্বার্থের উদ্দেশে, অনেক জঘন্য কাজ কি করে নাই? অবশ্য অনেক সময়, সেই সকল কাজের সহিত উচ্চতর নিঃস্বার্থভাবও মিশ্রিত ছিল।

এই নীতিবাদের আর একটি ভুল—ইহা স্বয়ং মঙ্গল এবং মঙ্গলের একটি প্রয়োগ-বিশেষ—এই উভয়কে এক করিয়া ফেলে। যদি অধিকতম লোকের পরম স্বার্থই মঙ্গল হয়, তাহা হইলে, ইহার পরিণাম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে;—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শুধু একটা সার্ব্বজনিক ও সামাজিক ধর্ম্মনীতিই আছে, নৈজিক কিংবা ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতির কোন অস্তিত্ব নাই; শুধু এক শ্রেণীরই কর্ত্তব্য আছে,—অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য; নিজেরপ্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমরা ঠিক্ সেই সকল কর্ত্তব্যকে ছাঁটিয়া ফেলিতেছি যাহার বিদ্যমানে অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করা সম্ভব হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ যাহাকে আমরা "আমি" বলি। এক হিসাবে আমিই আমার সমাজ;সেই সমাজে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। প্লেটো একটা কথা বেশ বলিয়াছেন:—আমি আমার অন্তরে একটা সমগ্র নগরকে বহন করিতেছি,—ভাব, ধারণা, বাসনা, প্রবৃত্তি,আবেগ চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা উহা অধ্যুসিত; এই সকলের জন্য বিধিব্যবস্থা স্থাপন করা নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু এই নীতিবাদ অনুসারে এই নিতান্ত-আবশ্যক আত্মশাসন ব্যবস্থাকেই রহিত করা হইতেছে; অর্থাৎ নৈতিক ধর্ম্মনীতিকে—আত্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন করা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন করিবার তিনটি উপায়।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্।

ইহলোকে, এই জীবিত অবস্থাতেই যিনি হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন করিতে পারেন, তিনি অমর হয়েন। হৃদয়গ্রন্থি কাহাকে বলে? "গ্রন্থিবদ্দৃঢ় বন্ধন রূপাঃ অজ্ঞান প্রত্যয়াঃ"। যেমন দরিদ্রের মলিন ছিন্ন বস্ত্রে শত গ্রন্থি থাকে, সেইরূপ মানব হৃদয়ে যে অজ্ঞান-প্রত্যয় সকল দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলে। অজ্ঞান-প্রত্যয়ের মধ্যে বিশেষরূপে তিনটী প্রধান। প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বে মূঢ় থাকিয়া মৃৎপাষাণাদি পদার্থে তাঁহার স্বরূপ কল্পনা। দ্বিতীয় তাঁহার অনন্ত মঙ্গল ভাবের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভরহীনতা। তৃতীয় কামনার বিষয় সকলের আপাত মধুময় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রেয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয়পথে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুপাশে পতিত হওয়া। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ও নির্ব্বিকার, ইহা আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে সপ্তাহে সপ্তাহে বা দিনে দিনে শ্রবণ করিতেছি কিন্তু তাহাতে আমাদের ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান হইতেছে না কেন? কেবল শ্রবণে জ্ঞান হয় না। যাহা শ্রবণ করিব তাহা সাধন না করিলে জ্ঞান হয় না। সাধনে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের—প্রত্যেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে, তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। এ তো সহজ পথ নহে, ব্রহ্ম ত চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত পদার্থ নহেন যে, তাঁহাকে আমরা সহজে প্রাপ্ত হইব। অথচ যাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জানিয়া বা না জানিয়া মানব অন্তঃকরণ হইতে একটি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সতত উত্থিত হইতেছে। কিন্তু তিনি মানব অন্তঃকরণে তৎপ্রাপ্তির জন্য যে পিপাসা দিয়াছেন, সে পিপাসা শান্তির নিমিত্ত সাধনরূপ মহাব্রত দিয়া এবং ধীশক্তিরূপ মহাঅস্ত্র দিয়া তৎপ্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন—

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

তিনি দুর্জ্ঞেয়, বিষয়মোহে হতচেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। তিনি দর্শন শাস্ত্রই পড়ুন আর তর্কশাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাঁহার জ্ঞান কদাপি তৃপ্ত হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়রূপে অগ্নি আছে, সেইরূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; বিশুদ্ধ সত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধ দারুনিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমাদের আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত

হইয়া আছেন, তিনি পর্ব্বতের গুহা গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাস শিখরে, তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে, তিনি ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গে, তিনি নির্জ্জন, দুর্গম, সঙ্কটস্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন তিনি আমাদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অজ্ঞান-প্রত্যয় দূর করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া প্রথম গ্রন্থি ছিন্ন করিবেন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহে। অধ্যাত্ম যোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দ সাগরে লীন হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই সেই দুর্দ্দর্শ গূঢ় পুরুষ সুদর্শ হইয়া আমাদের সহজ প্রত্যক্ষ্যের বিষয় হন এবং এই প্রকার যোগেতেই আমরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই প্রথম গ্রন্থি অজ্ঞান প্রত্যয় নষ্ট হয়, আমাদের সম্মুখে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হয়।

দ্বিতীয়, ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁহাতে নির্ভর হীনতা। যখন অধ্যাত্মযোগে তাঁহাকে দর্শন করিলে, তখন অবশ্যই দেখিলে যে তিনি যাহা, তাহাই তিনি। অর্থাৎ তিনি মঙ্গলময়, অনন্ত ও পূর্ণ। অধ্যাত্মযোগে সেই মঙ্গল অনন্ত ও পূর্ণকেই প্রাপ্ত হইলে। আমাদের জীবনের সমুদয় জিজ্ঞাসা, সমুদয় আকাঙ্ক্ষা এবং সমুদয় উদ্দেশ্য সেই একই মঙ্গলের জন্য। এক অধ্যাত্ম যোগেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, জিজ্ঞাসা পরিসমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষালাভ করিয়া ব্রহ্মসাধন করিয়া আর কি মানুষ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া চন্দ্র সূর্য্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, অগ্নি বায়ুতে তাঁহাকে খুজিয়া বেড়াইবে, তীর্থে তাঁহাকে খুজিয়া বেড়াইবে, "লেড়কা বগলমে ধুঁধুঁড়তা সহরমে" ছেলে তোমার কোলে অথচ ছেলেকে খুজিয়া বেড়ান যেমন, তোমার অন্তরে তোমার মঙ্গলময় বিধাতা দীপ্যমান, আর তুমি তীর্থে তীর্থে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ ইহাও সেইরূপ। ঋষি বলিয়াছেন যে, 'নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতেহি ধ্রুবং তৎ'। অধ্রুব পদার্থে সেই ধ্রুব পদার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি ধ্রুব পদার্থ, তাঁহাতে নির্ভর স্থাপন করিলে আর মৃত্যু-ভয় থাকে না। রোগে তিনিই ঔষধ, শোকে তিনিই সান্ত্বনা, দারিদ্রে তিনিই তৃপ্তি এবং মৃত্যুতে তিনিই অমৃত-আশ্রয়। এই অমৃত-আশ্রয়কে সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে ধরিলে চলিবে না। যেমন করিয়া লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে, ততোধিক, যেমন করিয়া গন্ধ পুষ্পকে আশ্রয় করে, যেমন করিয়া দাহিকাশক্তি অগ্নিকে আশ্রয় করে, যেমন করিয়া শীতলতা তুষারকে আশ্রয় করে, সেই প্রকার তুমি তোমার সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মাকে আশ্রয় কর, তোমার সকল সংশয় তিরোহিত হইবে, সকল নির্ভর তাঁহাতে যাইয়া তাঁহা হইতে অমৃত ফল লাভ হইবে। একটি গূঢ় রহস্যের কথা আছে। এই যে বহিরাকাশ অনন্তে বিস্তৃত হইয়া বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে ইহাই আমাদের

অধ্যাত্মজ্ঞানের সম্মুখে বিস্তৃত এক মহা প্রহেলিকা। অধ্যাত্মজ্ঞানের আবরণ হইতেছে এই কঠিন প্রহেলিকা। এই প্রহেলিকা ভেদ করিতে হইলে সৎগুরুর সমীপস্থ হইয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন যে

"সৎগুরু পাওবে ভেদ বাতাবে জ্ঞান করে উপদেশ,
কয়লাকো ময়লা ছুটে যব আগ কর পরবেশ"

অর্থাৎ সৎগুরুর নিকটে যাইবে, তিনি জ্ঞান রহস্য শিক্ষা দিবেন এবং অন্তর্বাহ্যের ভেদ বুঝাইয়া দিবেন। যখন জ্ঞানাগ্নি অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তথাকার অজ্ঞান সন্দেহাদি দূর হইয়া নির্ম্মল জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রকাশ্য ভাবে এই একই উপদেশ দিতেছেন যে, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'। অর্থাৎ—পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন! সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

এখন তৃতীয় গ্রন্থি, কামনার বিষয় সকলের আপাত মধুময় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রেয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয় পথে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুপাশে পতিত হওয়া। উপনিষদে আছে যে, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" স্বয়ম্ভু পরমাত্মা লোক লীলা সম্পন্ন করিবার জন্য ইন্দ্রিয় দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য সকলেই বহির্বিষয়ই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে কেহ দেখে না। স্বাধীন-বুদ্ধি মানব, ধীশক্তি সম্পন্ন মানব বহির্বিষয়ই দর্শন করে, প্রেয় পদার্থেই মোহিত হয়, ইহা কি মানবের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়? তুমি যেমন বহির্বিষয়ের অনুকূল ইন্দ্রিয় পাইয়াছ, তেমনি তুমি অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের জন্য স্বাধীনতা পাইয়াছ, ধীশক্তি পাইয়াছ। ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরে প্রয়োগ করিবে, ধীকে অন্তরে আত্মাতে প্রয়োগ করিবে না? ধীশক্তি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গল নিয়মের অধীন থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালন করিবে। এই ধর্ম্ম নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে একমাত্র প্রেয়েরই বশবর্ত্তী হইয়া শ্রেয় পথকে লঙ্ঘন করে, তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। সে তৃতীয় গ্রন্থির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আমাদের হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম! আমরা দুইয়েরই সন্ধিস্থলে বাস করিতেছি। একদিকে প্রেয় আমাদের পদদ্বয় বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে চাহে, আর অন্য দিকে মাতৃস্নেহ পূর্ণ শ্রেয় আমাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতে চাহেন। অন্তর-হলাহল মধুরভাষী প্রেয় আসিয়া বলে 'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্' তুমি শতায়ুবিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর, হস্তি হিরণ্য অশ্ব রথ তোমার জন্য সকলই প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্যগীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয় সুখদ-গন্ধামোদ সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ অপ্সরাগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে, যত লোক তোমার পদানত হইবে তুমি সকলের প্রভু হইবে,

তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে, তোমার যশঃ কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইবে। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তবে তুমি সকলের প্রভু হইবে। কিন্তু শ্রেয়ঃ-কামী মনুষ্য প্রেয়ের এই কথার প্রত্যুত্তর দেন যে, 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ' তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্প কালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে। অন্তক আমার পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধন প্রাণ সকলই হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার নৃত্যগীত অশ্ব রথ তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না। "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ" আমি কোন সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আমার চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না।

বিবেক বিজ্ঞান যুক্ত মানবের এইরূপ বাক্যে যখন প্রেয় নিস্তব্ধ হয় তখন শ্রেয় আসিয়া তাহাকে বলে, তুমি কেন শোকে নিমগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তি হীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি সুধাতে জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেম রূপ মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখ-সন্তপ্ত অশ্রু ধারাকে প্রেমাশ্রু ধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদায় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব। বাস্তবিক শ্রেয় যে আশ্বাসবাণী প্রদান করেন তাহা সত্য, আর প্রেয়ের লোভনীয় আশ্বাস বাক্য মরীচিকাবৎ অসার। যিনি শ্রেয়ের পথানুসরণ করিয়া তাহার উপদেশ বাক্য জীবনের আদর্শ করেন, তিনি হৃদয়ের তৃতীয় গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারেন। হৃদয় গ্রন্থি সমূহ ভগ্ন করিবার প্রথম উপায় ব্রহ্ম দর্শন, দ্বিতীয় উপায়, তাঁহার মঙ্গলময় ভাবে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল অবস্থাতে তাঁহারই মঙ্গল স্বরূপে নিমজ্জিত হইয়া থাকা, আর তৃতীয় উপায় হইতেছে বিবেকের সাহায্যে শ্রেয় পথে বিচরণ করিয়া সংসারে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করা।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভি র্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মন স্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।

PRAYERS.

(I)

O, Lord most high, we have come to Thee not with the pride of strength but with a humble and lowly heart, that Thou mayst uplift and elevate us. We approach Thee not as saints but as sinners, that Thou mayst deliver us from evil, and save us from ignorance and frailty. We come to Thee not bedecked with prosperity but as poor afflicted souls, that our days of misery may be brought to an end. We come to Thee as creatures tainted with impurity, that Thou mayst wash away our iniquities and fill our hearts with a holy and righteous spirit. Groping our way in the dark, we seek after Thee that Thou mayst lead us to Thy ineffable light. Entangled in the snares of death we call unto Thee, that Thou mayst conduct

* From ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান
By Maharshi Devendranath Tagore

us to Thy mansion of immortality. All that pertains to us is utter misery ; Thou art our only good and only bliss. Depending on Thee we eagerly await the kingdom of Truth, the Light and Life everlasting. Our faith in thy goodness is firm and unwavering. Lead me, O Lord, from out the false to the true. Lead me from darkness unto light, from death unto Immortality. O Thou that art self-effulgent, do Thou reveal Thyself unto me. O Thou dread Lord, may Thy benign face protect me for ever and ever, —Santih—Santih.

(II)

O Lord God of Truth, since Thou inspirest me with the hope that Thou wilt abide with me for ever and ever, surely Thou wilt fulfil it. Thou hast never failed them that put their trust in Thee. How long, oh how long shall I wait for the day when I shall enjoy the supreme happiness of seeing Thee face to face, and shall be privileged to live with Thee for ever more. O Lord my God, I have wholly surrendered myself to Thee, do Thou take me to Thyself. It is not for earthly gain or rank or fame that I have come to Thee. I have not sought Thy throne that Thou mayst show me the way to win the applause and esteem of my fellow men; I have sought Thy protection that Thou mayst renovate my soul with Thy strength and purge it of the taint of sin. O Saviour of the fallen ! to live for ever in Thy blessed company is my sole desire. Fulfil, O Lord, this my heart's desire. Grant that I may have the power strictly to adhere to Thy straight path, by overcoming all the dangers and difficulties and temptations of this world, that I may repose in Thy perfect love and do Thy will with all my heart. This is my only prayer O Lord ! Amen.

(III)

O Lord my God, may we always conserve Thy beauty in our heart. Thou art the Light that lighteth the sun, the moon and the starry heavens. The whole universe is radiant with Thy light. Thou art the light of our eyes and Thou art the light of our soul. Thou art the light of light—supremely Beautiful. If it be Thy will, O Lord, that we should be saved from the sin and sufferings of this world, then take us instantly by the hand and conduct us to Thy holy Presence. The storm and stress of this life are past all endurance. Abide with us as our Protector. If I am banished from Thy presence, the sun moon and stars lose their lustre in my eyes. O Lord of my heart, make me Thy constant companion and servitor.

"I ask Thee not for wealth or fame. Grant me only this privilege that I may remain Thy servant and attendant for ever and ever."*

নানা কথা।

তক্ষশীলা। বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই তক্ষশীলা বা টাক্‌সিলার স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানা অনুমান স্থান লাভ করিয়াছে। সার আলেকজাণ্ডর কনিংহাম Sir Alexander Cunningham ৮½ ইঞ্চ পরিমাণ তাম্রশাসন রাউলপিণ্ডী জেলার স্যাডেরাই Shah Dheri নামকস্থানে একটি স্তুপের ভিতরে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ স্থান N. W. Railwayর সরাই কালা Sarai kala নামক ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দুরে অবস্থিত। ঐ সাডেরাইয়ে যে অপর দুইটি ফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে তক্ষশীলার নাম লেখা আছে। কনিংহাম সাহেবের তাম্রশাসনে লেখা আছে, "সম্বৎসর মিতি ১০ তেন সভায়কেন থুবা প্রতিষ্ঠাপিতো মাতাপিতু পুয়ামি অথর

*ধনমান চাহিনা তোমা হতে, দেও এই অধিকার
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি—
ব্রহ্মসঙ্গীত।

কা পুরারি"। অর্থ, ১০ অব্দে সভায়ক কর্ত্তৃক এই স্তূপ তাঁহার পিতামাতার সম্মানার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাহা· মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার পাঠান্তর করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে অক্ষর ঐ তাম্রফলকে অঙ্কিত, বর্ত্তমানে তাহার আদৌ প্রচলন নাই। পাঠনির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ঐ সাভেরি ও তক্ষশীলা একই স্থান। Journal and the proceedings of the Asiatic society of Bengal. July. 1908.

মাধ্যামিক দর্শন—তির্ব্বতীয় ভাষায় ভারতের দর্শন গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে অনুবাদিত হইয়াছিল। মাধ্যামিক দর্শনের সংস্কৃতমূল ২৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ভারতে এক খানি ব্যতীত প্রায় সমস্তই বিনষ্ট, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ রহিয়াছে। মহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন ঐ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, আর্য্য নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, বুদ্ধ পালিতের রচনা। আচার্য্য ভব্য, যোগ-সাংখ্য-বৈশিষক বেদান্ত মীমাংসা সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০৭ সালে সিকিমে অবস্থান কালে Labrang লাব্রাং নামক মঠে ঐ সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐ গ্রন্থের নাম Yangyur। যে যে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ উহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার নাম ১। প্রজ্ঞানাম মূলমধ্যমককারিকা, ২। যুক্তিষষ্টিক কারিকা ৩। বেদল্য সূত্রনাম ৪। শূন্যতা সপ্ততি কারিকা, ৫। বিগ্রহব্যবর্ত্তনী কারিকা, ৬। মূলমধ্যমকবৃত্তি অকুতোভয়। ৭। বৈদল্যং নাম প্রকরণম্। ৮। শূন্যতা সপ্ততি বৃত্তি। ৯। বিগ্রহ ব্যবর্ত্তনী বৃত্তি। ১০। মহায়ন বিংশতিকা। ১১। অক্ষর শতক ১২। অক্ষরশতকনামবৃত্তি। ১৩। প্রতীত্য সমুৎপাদহৃদয়কারিকা। ১৪। প্রতীত্য সমুৎপাদ হৃদয় ব্যাখ্যান। ১৫। অবুধ বোধক নাম প্রকরণম্। ১৬। রত্ন সুকোষ নাম। ১৭। ভবসংক্রান্তি ১৮। ভবসংক্রান্তি টীকা ১৯। বুদ্ধ পালিত মূলমধ্যম বৃত্তি, ২০। স্বভাবত্রয়প্রবেশ সিদ্ধি ২১। হস্তবলনাম প্রকরণ। ২২। হস্তবলনাম প্রকরণ বৃত্তি। ২৩। মধ্যমহৃদয় কারিকা। ২৪ মধ্যমক হৃদয় বৃত্তি তর্কজ্বল। ২৫। মধ্য-প্রতীত্যসমুৎপাদ নাম। ২৬। মধ্যমার্থ সংগ্রহ। ২৭। মাধ্যমিকাবতারস্য টীকা নাম। The same paper.

অহল্যাবাই।—অহল্যাবাই ১৭৩৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুলহার রাও এর পুত্র খ্যাণ্ডি রাও এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। অহল্যা ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া রাজ্যশাসন করেন। এই ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুললনা বিবিধ সৎগুণের জন্য ভুবন বিখ্যাত। কথিত আছে, বারানসীর বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর-মন্দির, এবং গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির তাঁহারই অগাধ অর্থে বিনির্ম্মিত। তিনি প্রত্যহ সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নদান করিতেন। গ্রীষ্মের প্রখর রবিতাপ তপ্ত পথিকের পিপাসা দূর করিবার জন্য প্রশস্ত রাজপথের মধ্যে মধ্যে তিনি জলদানের ব্যবস্থা করেন। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপের সময় বস্ত্রদানের তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। The Calcutta university magazine august & september.

উত্তর মেরু।—বিগত শতাব্দীতে উত্তর মেরু আবিষ্কারের নিষ্ফল চেষ্টায় দুই শত জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। প্রায় আড়াই কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং চারিশত লোক প্রাণ দিয়াছে। প্রবুদ্ধ ভারত। সেপ্‌টেম্বর, ১৯০৮।

পালক।—বিলাতীয় মহিলাগণ তাঁহাদের টুপিতে বহুলপরিমাণে পাখীর পালক ব্যবহার করেন। The christian life এর ২৪ এ অক্‌টোবর তারিখের জনৈক লেখক বলেন অন্ততঃ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় মহিলাগণের ভিতরে এ কুপ্রথা তিরোহিত হওয়া উচিত। এই পালক সংগ্রহের জন্য কত পক্ষীর জীবন অকালে ও নৃশংসরূপে বিনষ্ট হয়।

জাপান।—জাপান দেশে তদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। বিগত দুই বৎসরে নবদীক্ষিতের সংখ্যা বার হাজারের অধিক হইয়াছে। 10 th October. the christian life.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১৫।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৬২। ৯
সমষ্টি	...	৩০৭৭৸৩
ব্যয়	...	২৭২॥৶৯
স্থিত	...	২৮০৫৶৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২০৫৶৬

২৮০৫৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০৭৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	১৲
	২০৭৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	২৮॥ ৬
যন্ত্রালয়	...	৬৫৲
সমষ্টি	...	৩১৫।৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫৮॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯॥/৩
পুস্তকালয়	...	৪॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৯৸/০
সমষ্টি	...	২৭২॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, শ্রাবণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৯৬২॥০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮০৫৶৬
সমষ্টি	...	৩৭৬৭॥৶৬
ব্যয়	...	৪৪৮৸৶৩
স্থিত	...	৩৩১৮॥৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৭১৮॥৶৩

৩৩১৮॥৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৶০
পুস্তকালয়	...	৪৮॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৬০৬।০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৭৫।৶০
সমষ্টি	...	৯৬২॥০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬০৸/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২॥০
পুস্তকালয়	...	৪।৶০
যন্ত্রালয়	...	১২০/৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৩১/৯
সমষ্টি	...	৪৪৮৸৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, ভাদ্র মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৬৯৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৩১৮৸৶৩
সমষ্টি	...	৩৫৮৮৷৴৩
ব্যয়	...	৩৩৫৮৴৩
স্থিত	...	৩২৫২৸০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৬১২৸০

৩২৫২৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২০১৲

মাসিক দান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়

২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্তবাবু বনমালী চন্দ্র ১৲

২০১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৬৷৵০
পুস্তকালয়	...	১২৴০
যন্ত্রালয়	...	৪৷০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১৫৮৶০
সমষ্টি	...	২৬৮৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৭৮৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৶০
পুস্তকালয়	...	১৷৶৩
যন্ত্রালয়	...	১০৬৷৴০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫৷৶৬
সমষ্টি		৩৩৫৮৴৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

আদি-ব্রাহ্মসমাজের ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী	১০৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	৫৲
শ্রীযুক্ত জে, ঘোষাল	৫৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার	১৲
	৫১৲
পূর্ব্ব প্রাপ্ত	৩৩২৲
	৩৮৩৲

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মহর্ষিদেবের তিরোভাব উপলক্ষে চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভা।

৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের দিন। এই দিন প্রাতে তাঁহার মধ্যম পুত্র সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতৃগতপ্রাণ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী পিতার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্মসাধারণের নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকাল ৪ ঘণ্টার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম শোক ও ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সমাগত হইয়া মহর্ষিদেবের বহির্বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলে প্রথমে সময়োপযোগী একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয়। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করেন এবং মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী হইতে তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিয়া সকলের চিত্তকে মহর্ষিদেবের মহজ্জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও সকলের হৃদয়কে মোহিত করিয়া তুলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বারা মহর্ষিজীবনে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি তিনি অনুরাগের সহিত কিছুক্ষণ মহর্ষির ব্রহ্মানুরাগিতার ব্যাখ্যা করার পর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের মহাভাব অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর শান্তিবাচন ও সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যশেষ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষিদেবের মুক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'অদ্য মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। এই অবসরে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিয়া এবং তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া ধন্য হইলেন। আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন কিন্তু যেখানে মহর্ষিদেব আমাদের সাধারণ পিতা সেখানে

আমরা সকলেই এক, এক গৃহের এক পরিবার। ব্রহ্মসভা যখন ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল, সেই শুভক্ষণেই মহর্ষি আমাদের পিতৃপদ অধিকার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ, ব্রহ্মের উপাসনা, তাহার দ্বৈতবাদ, ব্রাহ্মের দীক্ষা, ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজে তদনুকূল গৃহ্যানুষ্ঠান, এ সকলই মহর্ষির সৃষ্টি। সুতরাং তিনি আমাদের সকলের নিশ্চয় পিতা এবং গুরু। এই পিতা এবং গুরুর শ্রাদ্ধের আমরা সকলেই সমান অধিকারী। যে দিন দেখিব যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম স্ব স্ব গৃহে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেছেন, সেই দিন বুঝিব যে আমরা সকলেই তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। যে দিন দেখিব যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাঁহার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাঁহার দৃষ্ট সত্যে বিশ্বাস করিয়া মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে যত্ন করিতেছেন সেই দিন বুঝিব যে আমরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। আমরা জানি শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রই মহর্ষিদেবকে পিতা এবং গুরু বলিয়া প্রথম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। গুরুবাদের গোঁড়ামি যেমন পৌত্তলিক সমাজে অপকার আনয়ন করিয়াছে, গুরুবাদ বর্জ্জনও ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ অপকার আনয়ন করিয়াছে; ইহা দ্বারা ব্রাহ্মবালক ও যুবকবৃন্দ শ্রদ্ধাহীন হইয়া ধর্ম্মজ্ঞান হারাইতেছেন দেখিয়া মনে বড় সন্তাপ উপস্থিত হয়।

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" এই বিশেষ বাক্যের গুরুত্ব অধিক। ব্রাহ্ম সমাজে মতভিন্নতা এবং স্বাধীন চিন্তারও গুরুত্ব তেমনি অধিক। কিন্তু যখন দেখি নাভিকে অতিক্রম করিয়া নেমি স্বয়ং চলিতে চায়, তখনই বিনাশের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভীত হই। কেন্দ্র ছাড়িলেই চক্র গতিহীন হয়। যিনি পিতা, যিনি গুরু তিনিই ব্রাহ্মসমাজের নাভি। তাঁহার জীবনের সুন্দর, অতি সুন্দর আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের জীবনগত আদর্শ হউক এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনচক্র চালাইলেই আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপযুক্ত হইব।

মহর্ষি মুক্তপুরুষ। মুক্তপুরুষের আবার শ্রাদ্ধ কি, এ কথা উঠিতে পারে। কিন্তু শ্রাদ্ধ সেই ব্রহ্মগত পুরুষের জন্য নহে। শ্রাদ্ধ লৌকিক কল্যাণের জন্য—শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা চরিতার্থ করিবার জন্যই কৃত হয়। অতএব মহর্ষি আমাদিগকে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন আমরা তাহা দ্বারা আপনাপন জীবনকে উন্নত করিব ইহাই লক্ষ্য।

মুক্তাত্মা শরীরযোগে আবির্ভূত হন না, কেবল সান্নিকর্ষ উপলব্ধি করান। আমি ভাবিতাম এখানে মহর্ষিদেবের এত সেবা করিলাম এত স্নেহ ভালবাসা লাভ করিলাম কিন্তু তিনি এতদিন চলিয়া গিয়াছেন আর আমি তাঁহাকে হারাইয়া এত শোকার্ত্ত তা একদিন স্বপ্নযোগেও তিনি আমাকে দেখা দিলেন না। এই ভাবনা মনে করিয়া একদিন গিরিধীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণের অনুরোধে রবিবারে সমাজ মন্দিরে আমাকে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়। উপাসনান্তে উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের

"ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে"

এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া তাহার মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যান ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু এ ব্যাখ্যানে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না বলিয়া আমি তদুপরি শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যান অবলম্বন করিলাম। আমার বিবেক অমনি যেন রক্তচক্ষু হইয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিল, "রে নরাধম তোর গুরুর অবমাননা করিলি।" আমি ভয়ে ভীত, আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বাক্য স্তব্ধ হয় হয়, এমন সময়ে আমার সেই পরমভক্তি ভাজন গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিলাম। তিনি বলিলেন, "বৎস, ভয় নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যান অত্যন্ত আধ্যাত্মিক, বড়ই সত্য, বলিয়া যাও।" তখন আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, আমি অকুতোভয়ে অত্যন্ত অনুরাগের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলাম।

মুমুক্ষু যোগী জনের চিত্ত সংসারের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া কি ভাবে অনূর্দ্ধ থাকিতে পারে, মহর্ষিদেবের এই তিনটি বাক্যে তাহা বিশদ রূপে প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার (দিদিমার) সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে গোপীনাথঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা নাই। কিন্তু কত দিন পরে, কত অন্বেষণের পরে আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি"।

"এইক্ষণে তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ আমার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ"। এই অজ্ঞানান্ধকার সংসারের পরকূলে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথে তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক। এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতেই শাশ্বত ব্রহ্মলোককে অনুভব করিতেছি"।

"এই অকিঞ্চিৎকর দীন হীনের গৃহে তিনি অনেক দিন অতিথি হইয়া রহিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন। এখন তাঁর নিজের ঘরে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁর এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রেমাগারে চলিলাম। সেখান হইতে আর ফিরিব না"। আর এই যে চারিটি ঈশ্বরের বাণী তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা তাঁহার মোক্ষের সম্যক্ নিদর্শন।

১

"যতটুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, যতটুকু আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ততটুকু তোমার জয় লাভ হইয়াছে। এখন সম্যক্‌রূপে আমার কথা শুনিয়া চল যে এই সংসারের পর পারে উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধি লাভ করিবে।"

২

"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবে এবং নিত্যকাল আমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

৩

"ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য সহবাস লাভ করিবে।"

৪

"তুমি নমস্কারের সহিত আমাতে নিত্যযুক্ত থাকিবে"।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহ বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎজীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়; তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও আজ অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এই জন্য ৭ই পৌষ যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করবে—জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত; এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘ জীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনো দিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনো দিন বিচলিত হন নি; যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত, অনিরাকরণং মেঽস্ত—

ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি—যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়;—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরম লক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা তা নাকে বেষ্টিত করে—সেই সীমা কিছু না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারা সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন; সেই জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—তাকে নিয়ে আর আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই—তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্চে অমৃতের যোগ—মৃত্যুই সেই অমৃতকে প্রকাশ করচে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত নেই। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কি না ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেই জন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন, বনের ফুল পূজা অবসানে প্রসাদী ফুল হয়ে আজ বিশেষ-রূপে সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্ম্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এই জন্যে তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎ জীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষ তিনি একলা অমৃত জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকই জেনেছিল। ৬ই মাঘ মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি—সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

ঊনাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

প্রাতঃকাল।

পবিত্র মাঘোৎসব ১১ই মাঘ দিবসের প্রভাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৃহটি শ্রদ্ধাবান উপাসকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এবৎসর প্রবীন ও বর্ষীয়ান লোকের যেরূপ সমাগম হইয়াছিল অনেক দিন সে দৃশ্য আমরা দেখি নাই। ধূপ ধুনার গন্ধে সমাজ মন্দির আমোদিত হইলে ঠিক আটটার সময় শঙ্খ ধ্বনির পর অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু উদ্বোধন করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ও বিচিত্র ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহুত অনাহূত রবাহূতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্র স্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্বসাধারণের সঙ্গে আনন্দ মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎ সংসার নেই কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটি মাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয় পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্। কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিল্‌চেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায় সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাব্‌তে সুরু করি। কেননা, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই কি রাখব কি ছাড়ব এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠ্‌চে না, বায়ু বইচে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টি রক্ষা হচ্চে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাব্‌তে হয় কেননা সেটা যে আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট সংসারের অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার প্রভাত কালের সামান্য আয়োজন

চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

তবেইত দেখছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্ত্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্চে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলে, সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারেনা। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করেনা। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায়না, বলে যে বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক্—এমন কি, উপকার নাও করুক কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকেনা, সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছা তেমনি চল্‌ব অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আনব এ ত হয় না। গৃহিণীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয় তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুল্‌তে পারেন।

এই যে ইচ্ছার অধীনতা এতবড় অধীনতা ত আর নেই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করতে পারিনা—অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন আর কিছুই বাকি থাকেনা।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইচ্ছা, অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে'।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখ্‌তে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই—চাইতে পারবেন বলেই—আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেননি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেননি—সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেননা, চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর

ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌চেন আমি রাজখাজনা চাইনে আমাকে প্রেম দাও। হে প্রেমস্বরূপ তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমি"র লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

তাই যদি না হত তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হত?

"নাথহে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও—
মাঝে কিছুই রেখোনা রেখোনা—
থেকোনা থেকোনা দূরে!

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোনো অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎ যজ্ঞের হোম হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বলচি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌চিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে দাঁড়ায়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধূলা পেলেও সে যে বাঁচে!

সেই জন্যে, জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য বড় লাভ বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ এই প্রেমের দাবি তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। একদিকে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড, আর একদিকে আমার এই আমি! এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম আমি যে মিল্‌বেন!

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎ-রাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমাজ নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর এক্‌লা, কি অনন্ত এক্‌লা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই "আমি" টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন "আমার চন্দ্রসূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেন না ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি হয়েছ, তুমি আছ!"

এই খানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বল্‌তে পারি—"আমি তোমাকে চাই নে! সে কথা তাঁর ধূলোজলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না—তারা তখনি মারতে আসে! কিন্তু তাঁকে যখনি বলি "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই,

খ্যাতি চাই।” তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এদিকে কখন্ এক সময় হুঁস্ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলৎ কোনোমতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে! সেখানে ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বল্‌তে পারব, আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বল্‌তে পারব চন্দ্রসূর্য্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার “আমি” জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার “আমি” ক্ষেত্রের একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎজুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন তাহলে জোড়হাত করে মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাঁকে মান্‌তুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙ্‌তেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে!

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না! শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশ পথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝ্‌তে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যে দিন আমার প্রেম জাগ্‌বে সে দিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাক্‌বে না। কেন যে “আমি” হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি সে দিন সেই বিরহ দুঃখের রহস্য একমুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশু পক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে “আমি” বলচি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র “আমি,” একলা “আমি” অনুপম অতুলনীয় “আমি”। এই “আমি”-র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহাবিজন লোকে হে আমার অন্তর্যামী তুমি ছাড়া কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে এই বিশেষ লীলায়

তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব!

এই আমিটিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনচ। কত সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণু পরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে এই "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা-বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হক্, তোমার চেয়ে বড় না হক্! আর আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টাদ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি সেইটেই নানাদিক্ দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি—কিন্তু আমি রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই। এই আমিক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচ্‌বে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই "আমি"-নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা এইজন্যেইত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান। সেই জন্যেইত এই খানেই মৃত্যু, এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

প্রাতঃকালের উৎসবে যে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত এবার রচিত ও গীত হইয়াছিল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গুণকেলী—নবপঞ্চতাল।

জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে॥
তোমারে নমিহে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমিহে সকল জীবন-কাজে;
তনুমনধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে॥

টোড়ী—নবতাল।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া॥
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে,
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

আসাবরী—কাওয়ালি।

তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও॥
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও॥

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালি।

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে, এস গানে॥

এস, অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস, চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে॥
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এসহে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে॥

প্রাতঃকালের সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

ঐ দিন মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গন বিচিত্র পুষ্প ও বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। উপাসনার সময় যদিও সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথাপি সন্ধ্যার বহুপূর্ব্ব হইতে জন সমাগম হইতে লাগিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে জনস্রোতে প্রাঙ্গন ও দ্বিতল পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনের উপাসক ও দর্শক দুই সহস্রেরও অনেক অধিক হইবে। এরূপ নিস্তব্ধ জনতা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার অত্যুচ্চ সুকণ্ঠে বেদগান আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধ পুলকে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্বোধন নিম্নে প্রকাশ করা গেল। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু সঙ্গীত-মঞ্চে বসিয়া গায়কগণের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সেদিনকার সঙ্গীতকে আরও মধুময় করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের অষ্টমবর্ষ বয়স্ক কল্যাণীয় শ্রীমান সৌম্যেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার এই তরুণ বয়সে বালকণ্ঠে সকল সঙ্গীতে আশ্চর্য্যভাবে যোগ দিয়া যে গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় মহর্ষিদেবের পূত বংশে কোনকালে প্রতিভার অভাব ঘটিবে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমানের আশ্চর্য্য শক্তি সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার সেই গুরু পরিশ্রমের উপর রাত্রিকালে যে অমূল্য উপদেশ দেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা যে ভাবে চিত্রিত করেন তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার এই উপদেশ চিরদিনের ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে লালিত পালিত; কিন্তু সেদিনকার তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অনেক রহস্য পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারি নাই, অনেক সঙ্কীর্ণতা যাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই, তৎসম্বন্ধে সত্য সত্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এবং একথা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে সকলেই আমাদের সহিত এসম্বন্ধে একমত হইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিলেন।

প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হতঙলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং॥

জগতের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহা প্রেমবন্ধন। মানবাত্মার কূটস্থ মর্ম্ম গহ্বরে একের জন্য অন্যের যে এক চিত্তমোহিনী আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা প্রেম, দুরান্ত আকাশ মার্গে এই যে রাশিচক্র ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে, কিন্তু স্বীয় রেখার বিন্দু মাত্র অতিক্রম করিতে পারে না যাহার বলে, সেই সেতুবন্ধন প্রেম বন্ধন। কে এই প্রেম বন্ধনে জগতের অন্তর্বাহ্য মঙ্গল নিয়মে নিবদ্ধ করিয়াছেন?

"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়া যেন স্বস্তভিতং যেন নাকঃ।

যে প্রেমময়ের প্রেম আকর্ষণে দ্যুলোক উগ্রভাবে দণ্ডায়মান পৃথিবী দৃঢ় ভাবে স্বীয় কক্ষে ঘূর্ণিত হইতেছে, স্বর্গ এবং আদিত্য স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে।

"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।"

যিনি নিজ মহিমা দ্বারা এই চক্ষু কর্ণ এবং প্রাণবিশিষ্ট জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু, হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং এই গভীর সমুদ্র যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহারই প্রেমে জগৎ হাস্যময়, তাঁহার দানে জগৎ পুষ্ট, তাঁহার শক্তিতে জগৎ শক্তিশালী তাঁর প্রাণে জগৎ প্রাণবান—তিনি প্রেমময় তাঁহাকেই আমরা চাই, কেবল চাই তাহা নহে, তাঁহাকে পূজা করিতে চাই, তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি, আমরা সমুদয় কামনার বিষয় লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। সেই পরম পুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমময় আনন্দময় আমাদের সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি। ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্য পরলোকের উন্নত ভোগস্পৃহা সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, যখন সেই প্রেমময় অনন্ত মহাসাগরে আমরা নিমজ্জিত হইতে পারি, যখন নমস্কারের সহিত তাঁহাতে যোগযুক্ত হইতে পারি। আজ মাঘোৎসবের রজনী। অদ্য কোন তামসিক আমোদ আহ্লাদের জন্য আমরা এখানে সমবেত হই নাই। কোন রাজসিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যও এখানে আগমন করি নাই। হে ভাই, হে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, একবার ঊর্দ্ধে চক্ষু উত্তোলন কর; একবার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে চিত্ত সংযোগ করিয়া সমাহিত হও, দেখিবে যে, ইহলোক পরলোক ইহকাল পরকাল কেবল একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন মাত্র একটা প্রহেলিকা মাত্র। ইহারই অতীত মার্গে পড়িয়া রহিয়াছে তোমার একটা স্মৃতির ছায়া, ইহারই ভবিষ্যত পটগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে তোমার অনুমানের আশার একটা ছবি। ইহারই অন্য নাম ঋষিরা দিয়াছেন নশ্বর জগৎ। যদি ইহা নশ্বর জগৎ তবে ইহা ক্রীড়ার স্থান নহে, অপরিণামদর্শী মানবের অল্পায়াসলভ্য সুখের আলয় নহে। সুখ যদি যথার্থই ইচ্ছা করিয়া থাক তবে নিষ্ঠাকে অবলম্বন কর। একবার তোমার আত্মার গভীর অন্তরে প্রবেশ কর এবং দেখ যে তোমার সেই প্রেমময় পিতা ইহ উৎসবের দেবতা শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে, আনন্দরূপং অমৃতং রূপে এবং সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে দীপ্যমান রহিয়াছেন। সেখানে কালের গতি নাই, দেশের রেখা নাই। কেবল তিনি ও তুমি। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে জ্ঞান চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া প্রেম পুষ্পে তাঁহার পূজা করিয়া মৃত্যু হইতে অমৃতে চলিয়া যাও। প্রেমই তাঁহার পূজার পুষ্প। এস ভাই এই প্রেম পুষ্প দ্বারা হৃদয়াঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করি ও জীবনকে সার্থক করি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করচি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানেনা সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়—সে জানেনা, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানেনা। তবু একথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করচেনা—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠচে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসচি।

আমরা কি করূচি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করূলে চল্‌বে না।

আমরা মনে করছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এই টুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানব-সমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বল্‌তে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবেনা; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বল্‌ব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারেনা। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাক্‌তে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক্ আর পণ্ডিতই হোক্, সে রাজচক্রবর্ত্তী হোক্ আর দীন দরিদ্রই হোক্, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন—সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "বেদাহং", আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে

আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আস্‌তে থাকে তখন যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশ-দেশান্তরে সম্পদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজ্‌তে থাক্‌ত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে—সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়—সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহাঃ"—

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা!" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল্‌চে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘট্‌লে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বল্‌তে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আস্‌তেই হবে, তাকে বল্‌তেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে "বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌চিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখ্‌ছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে

তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার; সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বল্‌চে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও! সে বল্‌চে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত "না" দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জান্‌লে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জান্‌লে, নিম্ন দেশ যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও—এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমারি ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বল্‌চে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "এক-সূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—শৃণ্বন্তু বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগণের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃপরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ!"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসচে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ

করছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বল্‌ছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে!

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

আমাদের দেশে আজ বিরাট্ মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধর্‌তে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক!

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত আমাদের নিদ্রা নেই দেখচি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেচেন, আর আমরা সুস্থির থাক্‌তে পারচিনে! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি! এ পথের পাথেয় আছে বলে জান্‌তুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আস্‌চে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এম্‌নি আমাদের মনে হচ্চে। কেননা, কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে

দেখ্‌ছি বাতায়নে এক একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্যসঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুল্‌বেন। সেই মহা সঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলেনা যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক! তবে আমরা আর এ স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে! এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের। না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্ম সমন্বয় জাতি সমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে!—বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর,নিজেকে দরিদ্র বলে

জেনোনা, দুর্ব্বল বলে মেনোনা—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরোনা—সত্যকে সকলের ঊর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচ্‌চেনা, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উট্‌চেনা, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ কর্‌চে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়চে; স্বার্থ আরাম,অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু তুমি আমার পক্ষে আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্ত্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবারজন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথায় পেতে নিই—ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারেনা, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পূরবী—তেওরা।

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী আহা।
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে আহা।
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি
দেহ পুলকিত উদার হরষে আহা।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল মাঝে, জোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে নিশি আঁধারমাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে।

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে।
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে॥

ইমন মিশ্র—একতালা।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিবহে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিবহে!
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিবহে!
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিবহে।
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিবহে!
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥
জানিনা বলিয়া তোমারে স্বীকার করিবহে,
জানি বলে নাথ তোমারে হৃদয়ে বরিবহে।
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিবহে—
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥

মিশ্র সিন্ধু—কাওয়ালি।

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে॥
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুতঘাতে।
দ্বার খোলোহে দ্বার খোলো—
প্রভু কর দয়া দেহ দেখা দুখরাতে॥

সুরট—কাওয়ালি।

কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে—
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর কর, ওরে
জাগ সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালরে জ্বালরে
ডাক আকুল স্বরে এসহে প্রিয়তম॥

হাম্বীর—তেওরা।

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।
পুরাণো আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চির জনমের পরিচিত ওহে, তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কিছু ডর,
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই॥

বেহাগ—একতালা।

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপইন্দু—
চিত্ত কুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু।
নব-নন্দনতানে চির বন্দন গানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে
উথলা চেতনাসিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ নাথ,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু"॥

মিশ্র বাহার—যৎ।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর সীমা, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্ এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
লোকের কথা নিস্‌নে কানে
ফিরিস্‌নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

বাউলের সুর—একতালা।

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা, (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়
এ যাত্রা তুমি থামাও। (বন্ধু)

আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব
কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোরে থামাও! (বন্ধু)

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বালকগণের প্রতি উপদেশ।

তোমাদিগকে নিয়ে আজ আমরা ভগবানের পূজার জন্য এখানে এসেছি। জীবন যেন তোমাদের সার্থক হয় এই কামনা। তোমরা শুনে থাকবে তিনি অমূল্য ধন, কোন মূল্য দিয়ে তাঁকে কেনা যায় না। তোমরা ভেবোনা যে আমরা ছোট ছেলে, ভগবানকে আমরা বুঝতে পারব না। ভেবো না, যে তিনি মস্ত বড় জিনিস, জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রবীণ বিজ্ঞেরাই তাঁকে চেনেন জানেন বোঝেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ধারণায় কি কখনো তাঁকে ধরা যায়? এই তরুণ হৃদয়ের সামান্য অনুভূতিতে কি কখনো তাঁকে বোঝা যায়? তোমরা জাননা যে শিশুদের তাঁতে কি আশ্চর্য্য অধিকার। তোমাদের সোজা বুদ্ধিতে তাঁকে সহজে ধরা যায়, তোমাদের সহজ মনে তিনি সহজে প্রকাশ পান। আশ্চর্য্য তাঁর স্বভাব! দুরূহতার মধ্যে তিনি অত্যন্ত দুরূহ, সহজের মধ্যে তিনি নিতান্ত সহজ। তোমরা তাঁকে চেন জান, বোঝো কেবল নাম দিতে জান না যে, এঁকে বলে ভগবান। কচি শিশু আলো দেখ্‌লে কত আনন্দিত হয়, কত উৎফুল্ল হয়ে খেলতে থাকে, সবাই তোমরা দেখেছ। সে যেমন আলো জিনিষটীকে চেনে, জানে, বোঝে, কিন্তু নাম জানে না, বলতে জানেনা এটা আলো, সেইরূপ তোমরা অহরহ ভগবানের মধ্যে রয়েছ ও ভগবান তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমরা তাঁকে দেখছ চিনছ বুঝছ কেবল নাম জান না যে এঁকেই বলে ভগবান। যে জিনিষকে লোকে খুব ভালবাসে তার গুণ তার ভাব, তার কথা বলে শেষ ক'রে উঠতে পারে না জানত? লোকে বলে ভগবানকে বলা যায় না তার অর্থ এ নয় যে একেবারে তাঁকে বলাই যায় না। তাঁকে বলে শেষ করতে পারা যায় না এই হচ্ছে তাঁর আসল ভাব। যদি তাঁকে বলা না যেত তবে এত কথা কোথা থেকে জন্মাত? কেনই বা জন্মাত? বলা তাঁকে যায়, কেবল, কত তাঁকে ভালবাসি সেইটি বলা যায় না।

তোমাদের অধিকার তাঁতে অত্যন্ত বেশী, তাই বড় সহজে তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ পান। কোথায় তিনি জান? এই দিনেতে তিনি দিনমনি, জ্যোৎস্নায় তিনি চন্দ্রমা, সুগন্ধে তিনি পুষ্পরাশি, সুপ্তিতে তিনি অন্ধকার। তোমাদের প্রত্যেকে তিনি চৈতন্য, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, তোমাদের ত্যাগের মধ্যে দয়া তিনি বিধান করিতেছেন। তোমাদের মঙ্গলে তিনি আনন্দময়।

মঙ্গলে তোমরা আনন্দিত হও, ত্যাগে তোমরা দয়াময় হও, পরস্পরের মধ্যে তোমরা প্রেমময় হও, তোমাদের চৈতন্য উদ্বোধিত হউক, তোমরা ভগবানের সঙ্গে

যুক্ত হয়ে জগতে পরম কল্যাণের প্রতিষ্ঠা কর।

ওঁ শান্তিঃ।

নানা কথা।

বিবাহ।—বিগত ২০এ জানুয়ারি আমাদের প্রধান রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড মিণ্টোর কন্যার সহিত ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব শ্রীযুক্ত লর্ড ল্যানসডাউনের পুত্রের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিবাহ কেথিড্রেল গির্জ্জায় সুসম্পন্ন হয়। বিবাহান্তে বিশপ যে উপদেশ দেন তাহার মর্ম্মার্থ এই "জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। আমরা যে কিছু কর্ম করি, বিপদে নিপতিত হই, বা সম্পদে উৎফুল্ল হই এ তাবৎই অবসর ক্ষেত্র; এসকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন ও স্থায়ী দান অবতীর্ণ হয়—ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের অন্তরে আসিয়া উপদেশ দেন। উহা বাস্তবিকই অমূল্যধন, যদি আমরা শান্তপ্রাণে উহা শ্রবণ করি হৃদয়ে পোষণ করিতে সচেষ্ট হই এবং উহার প্রতি উদাসীন না হই। (Christ এ) ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হে পুত্র কন্যা! ঈশ্বর তোমাদিগকে আজ তাঁহার সমীপে আহ্বান করিয়াছেন—এই দৃশ্যমান উপাসনা ক্ষেত্রে নহে—কিন্তু সেই মন্দিরে যাহা তিনি নিজে সংরচন করিয়াছেন। তিনি চান আজ তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর। তোমাদের উভয়ের প্রীতি উভয়ের প্রেম যাহাদ্বারা তোমাদের জীবন আজ জ্যোৎস্নাময়, বন্ধুগণের অনুরাগ, সমস্ত সাম্রাজ্যের সহানুভূতি, সেই মন্দিরের উপাদান। আমরা সেই মন্দিরের বাহিরে রহিয়াছি কিন্তু তোমরা ঐ মন্দিরের ভিতরে। সেখানে যাইয়া তাঁহার বাণী আজ তোমরা শ্রবণ কর। পরমপিতা সেই প্রেম ও আনন্দের মন্দিরে লইয়া গিয়া তোমাদিগকে যাহা শুনাইবেন তাহাই তোমাদের এই উদ্বাহ দিবসের অমূল্য সম্পত্তি। তিনি যে তোমাদিগকে আজ কি বলিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে পাইতেছি না কিন্তু তোমরা তাহা শুনিতে পাইতেছ। তিনি তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছেন এবং যাহা বলিতেছেন শ্রবণ কর। বাহিরের এই সৌন্দর্য্য ও কোলাহলের ভিতরে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর, তাঁহার মৃদুমন্দ বাণী অবশ্যই শুনিতে পাইবে। বল ভগবন্ তোমার বাণী শুনাও, তোমার চরণাশ্রিত সেবক তাহা শ্রবণ করিতে প্রস্তুত।"

সভ্যতা কোন্ পথে।—ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কতকগুলি আমেরিকার ও ডেনমার্কের অধিবাসী দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে যাভা দ্বীপে Java Reptile Skin Co. যাভা সর্প-চর্ম্ম কোম্পানি নাম দিয়া একটি ব্যবসা খুলিয়াছেন। সর্পের চর্ম্ম সরবরাহ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক আনা হইতে পাঁচ টাকা মূল্যে এক একটি সর্প তাঁহারা খরিদ করিতেছেন। জীবন্ত সর্পের মূল্যই অধিক। মৃত সর্পের মূল্য কয়েক আনা মাত্র। জীবন্ত ময়াল জাতীয় বোয়া সর্প যাহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, তাহার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, উহার চর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐরূপ একটি সর্পকে ধরিয়া তাহার মস্তক একটা ফাঁসের ভিতর গলাইয়া উর্দ্ধে টাঙ্গান হয়। নিম্ন হইতে লোকে তাহার লেজ টানিয়া ধরিয়া থাকে। পরে ঐ জীবিত সর্পের ঘাড়ের চারিদিকে ছুরিকা যোগে বৃত্তাকারে চর্ম্মটি কাটিয়া সমস্ত চর্ম্মটি ঠিক সমানভাবে টানিয়া ছাড়ান হয়। এইরূপে লেজ পর্য্যন্ত সুগোল চর্ম্ম বেশ খসিয়া আইসে। চর্ম্মহীন সর্পটি ঘণ্টাকাল ছটফট করিয়া মরিয়া যায়। ঐ চর্ম্ম পরে পরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইয়া মনিব্যাগ ও পাশ্চাত্য রমণীর কোমরবন্দ আকারে বর্ত্তমান সভ্যতাকে ফুটাইয়া তোলে। কি ভীষণ ও লোমহর্ষণ ব্যাপার!

অমৃতবাজার ১৫ই জানুয়ারি।

কবি মিল্টন।—কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন ১৬০৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাহার পর তিন শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মোৎসব লইয়া অনেক স্থলে সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া সভ্য-জগৎ সত্যসত্যই ধন্য হইয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—মহর্ষিদেবের আদর্শ জীবন লইয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৬ই মাঘ বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আদি-ব্রাহ্মসমাজে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

মৃত্যু।—শিবনারায়ণ পরমহংস আজ কয়েক দিবস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্যাপককাল ধরিয়া কালিঘাট মনোহরপুকুর নামক স্থানে থাকিতেন। তিনি তাঁহার সারল্যে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবেন।
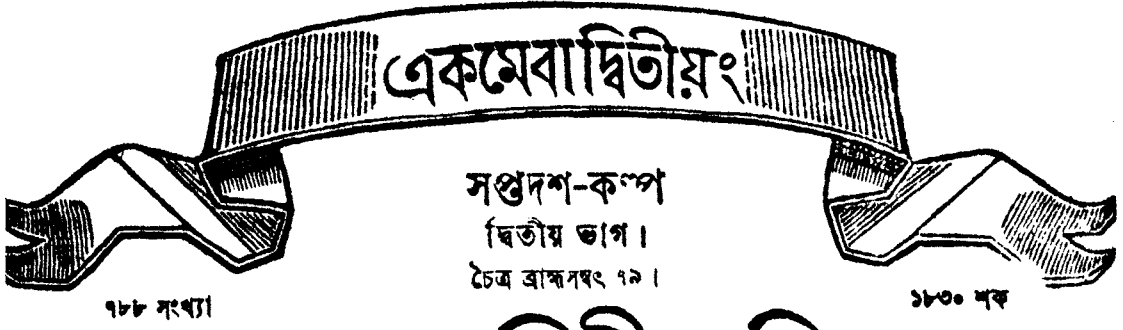
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

প্রেমিক ধর্ম্ম।

তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের প্রস্রবণ হইতে নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন সেই নদীর প্রবাহে বসুন্ধরা উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হয়, সেই নদীর উপকূলে কত নগর নগরী পত্তন হইয়া মনুষ্যের বাসোপযুক্ত হয়, তাহার বক্ষোপরি কত বাণিজ্যতরী ধনধান্য বহন করিয়া জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। সেই নদী যে যে স্থান দিয়া বহিয়া যায় সেই সকল স্থান শোভা সৌন্দর্য্য শ্রী সম্পদে পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই নদী তাহার প্রস্রবণ হইতে বিযুক্ত হইলে অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার পার্শ্বস্থ ভূমি নির্জ্জলা নিষ্ফলা হইয়া পড়ে, ফল ফুল শস্য মরিয়া যায়। ঈশ্বর-প্রীতি সেইরূপ আমাদের সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রস্রবণ। জগতের ইতিহাস দেখ, ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগের প্রবর্ত্তনা কোথা হইতে? কিসের বলে তাহারা ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়? দেখিবে তাহাদের কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক ঈশ্বর-প্রীতি।

ঈশ্বর যিনি 'প্রেমের আকর ভূমি' তাঁহার সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার প্রেম-বন্ধন। তিনি আমার, আমি তাঁহার—জীবাত্মা পরমাত্মার এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তিনি আমার আমি তাঁহার—আমি কোটি কোটি প্রাণীর মধ্যে মিশিয়া গিয়া আত্ম-হারা হই না। একদিকে যেমন তাঁহার করুণা—তাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপী, তেমনি আবার প্রত্যেক আত্মার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ; আমার আত্মার উপরেও তাঁহার প্রেমদৃষ্টি নিরন্তর রহিয়াছে। তিনি আমার আমি তাঁহার—আমি আর তিনি ভিন্ন যেন আর কেহই নাই! একের ভাল-বাসায় প্রেমের সফলতা হয় না—দান-প্রতিদানে প্রেমের পূর্ণতা। ঈশ্বরপ্রেমী ঈশ্বরের নিকট হইতে এই প্রেমের প্রতিদান চান, প্রতিদান পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভগবানের নামই হচ্ছে ভক্তবৎসল।

গীতা বলিতেছেন ঃ—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বংচ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

যিনি আমাতে সর্ব্বতোভাবে তন্ময়, তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলেন না আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করি না।

এই যোগের কি মধুময় ফল! এই যোগবলে জীবন সুধাময় হয়।

"সকলি সুধাময় যখন তাঁর সাথে ভয়-তাপ কি থাকে সে অমৃত নিকেতনে পা-ইলে—সংসার যাতনা সব ভুলিয়ে যাই।"

সেই মঙ্গলময়ের সহবাসে আমরা দিন দিন প্রেমের পথে, মঙ্গলের পথে অগ্র-সর হই। কোন মানুষ কাছে থাকিলে আমরা দুষ্কর্ম্ম করিতে কত না ভীত হই তবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ লজ্জায়, কি সাহসে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইব? যদি কোন প্রলোভন আসে তাহা অতিক্রম করিবার বল পাই। যদি মোহবশতঃ কখন পাপ-পঙ্কে পতিত হই—জানি সেই করুণা-ময় আমার সঙ্গে আছেন—তাঁহার অসীম ক্ষমাগুণে আশ্বসিত হই যে তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। তাই উপনিষদে আছে—যিনি পরমাত্মার সহিত এই প্রেম-যোগ বন্ধন করেন তিনি শোক তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন—

> সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
> তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
> গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

আমরা এই মৃত্যুময় সংসারে বাস ক-রিতেছি, এই প্রেম আমাদের মৃত-সঞ্জী-বন ঔষধ।

খ্যাতনামা রুষীয় মহাপুরুষ Count Tol-stoi প্রেমিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রেমের নিয়ম জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ। মানুষ যতই দুশ্চরিত্র হউক না কেন, তাহারও সঙ্গে সাধু ব্যবহার করিয়া দেখ, দুদিন দেখ, এক সপ্তাহ দেখ, পরে আত্মজিজ্ঞাসা কর এইরূপ আচরণ কি তোমার নিতান্তই কষ্টকর হইয়াছে—ইহাতে তোমার আত্মার উন্নতি কিম্বা অব-নতি হইয়াছে? দেখিবে তোমার উন্নতি বই দুর্গতি হয় নাই। যে তোমার প্রতি অন্যায় করিয়াছে তাহারও ভাল করিবার চেষ্টা কর, নিন্দা অপবাদ ছাড়িয়া দেও, জীব জন্তু মনুষ্য সকলেরই প্রতি দয়া মায়া মমতা কর—পরীক্ষা করিয়া দেখ এই আচরণের ফল কি হয়? পরীক্ষাতে দেখিতে পাইবে তোমার জীবনের আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন হইয়াছে—অবসাদের পরিবর্ত্তে আ-ত্মপ্রসাদ লাভে তুমি প্রসন্ন হইবে। কিছু কাল ধরিয়া এই ভাবে দিনযাপন কর দেখিবে তোমার আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—তোমার আত্মা শান্তিসুখে পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে প্রেমিক ধর্ম্ম কেবল মৌখিক নহে—তাহা সজীব ধর্ম্ম—তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী।"

এই প্রেম সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা সংসারে বিস্তারিত হইয়া সংসারকে মধুময় করে। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমরা সংসারধর্ম্ম উৎসাহে আনন্দে সম্পা-দন করিব। যাহাতে লোকসমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার সহায়তায় প্রাণপণে সচেষ্ট হইব। আমাদের চারিদিকে দুঃখের যে গভীর আর্ত্তনাদ উঠিতেছে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিব। আপনাকে ভুলিয়া সেবা-ধর্ম্মে নিরত হইয়া বিপন্নকে আশ্রয়দান, পীড়ি-তকে ঔষধ পথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান, পতিতকে উদ্ধারের চেষ্টা—এই সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও তৎপরতা হইবে। এই প্রেমের সঙ্গে স্বার্থের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই।

জননী যখন সন্তানের লালন পালনে নিযুক্ত থাকেন তখন কি তিনি নিজের দিকে এতটুকুও দৃষ্টি করেন ?

আমরা সংসারের নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছি—কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। শরীর নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক—পরিবার পোষণের জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন—কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত স্বার্থের সংস্রব এক—আর ব্রহ্মপ্রীতিতে কর্ম্ম করা অন্যরূপ। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা তখন হইবে, "যখন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে।"

আমরা যখন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম করি সেই কর্ম্ম দ্বারাই আমরা স্বাধীন হই—সেই কর্ম্ম তখন মুক্তি! তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্ম্মের বৈচিত্র্য বিলীন হয়, সংসারের নানা দুঃখ কষ্টের আনন্দ-অবসান হয়।

ব্রহ্মের সহিত আমাদের প্রেমবন্ধন—এই যে যোগ ইহা অমৃত যোগ। তিনি যদি আমার হইলেন, চিরকাল তিনি আমারই থাকিবেন—সে সম্বন্ধ এখানেই শেষ নহে। পরকালে অবিশ্বাস অন্তরে আর স্থান পায় না। সহস্র যুক্তি তর্কে যাহা না হয় এই যোগে তাহা সিদ্ধ হয়। পরকাল-তত্ত্ব ভক্তের মানসপটে জাজ্বল্যমান ফুটিয়া উঠে।

সংসার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র—লোকসমাজে আমাদের জীবনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাই বলিয়া আমরা অন্ধের ন্যায় দিশাহারা হইয়া কার্য্য করিব না। যে কোন কর্ম্ম করি আমাদের লক্ষ্য সেই একের প্রতি স্থির, তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না। বাহিরের অবস্থানুসারে আমাদের কর্তব্য সাধন কিন্তু পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ নির্ভর ও আত্ম-সমর্পণ—এই আমাদের জীবন। ইহার উপমাস্থল সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ যাহা মেঘমালা অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর গগনে সমুত্থিত হয়—তাহার বক্ষোপরি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের উপদ্রব—কিন্তু তাহার শিখরদেশ নিরবচ্ছিন্ন রবিকিরণে সমুজ্জ্বল।

সংসারের কর্তব্য পালন আমাদের উচ্চ অধিকার স্বীকার করি কিন্তু বৌদ্ধদের মত আমরা কেবলমাত্র নীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না। অনন্তের অভিমুখে আত্মার গতি—পূর্ণতা তাহার লক্ষ্য। আত্মার এই অনন্ত আশা, অক্ষয় পিপাসা, চিরবর্দ্ধনশীল প্রেম নিম্নতর নীতিক্ষেত্রে পূর্ণ হয় না। যে কোন বস্তু শুধু সংসারেই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে তাহা লইয়া আমরা কি লইব? ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর গভীর উক্তি আমাদের আত্মাতে প্রতিধ্বনিত হয়—

যেনাহং না মৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং

আমাদের আত্মা সেই যোগমন্দিরে প্রবেশ করিতে উৎসুক যেথানে যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে—সে আনন্দের বিরাম নাই সে আনন্দের তুলনা নাই।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি
সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ং
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসে যখন যোগী উপরতচিত
আত্মাতে আত্মায় দেখি হন পুলকিত,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অচল যখন
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দে মগন ;
অপার আনন্দ তাঁর, শান্তি অবিরাম,
ধ্যানযোগে আত্মাতে নিরখি আত্মারাম,
যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে
যার গুণে গুরুদুঃখ তুচ্ছ তাঁর মনে ;
এ হেন সাধনাগুণে যোগী পাপহীন
ব্রহ্মপরশন-সুখ ভুঞ্জে অনুদিন।

মনুষ্যের তিন অবস্থা।

আসক্তি বৈরাগ্য ও প্রেম, মনুষ্যের এই তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই।

অতিরিক্ত অনুরাগের নাম আসক্তি।

যে ব্যক্তি অর্থে আসক্ত, অর্থে তাহার প্রাণমন সমর্পিত। তাহার অর্থগত প্রাণ। তাহার এক পয়সা মা বাপ। সে টাকায় বাঁচে, টাকার ক্ষতিতে মরে।

কিরূপ মানসিক অবস্থার নাম আসক্তি? কিরূপ ব্যক্তিকে আসক্ত বলা যায়? যখন কোন পার্থিব পদার্থের প্রতি কোন ব্যক্তির সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তখন বলিতে পারি, সে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত। যখন দেখি, সেই পদার্থের মিলনে তাহার অতিশয় সুখ, এবং তাহার অভাবে তাহার অতিশয় দুঃখ, তখন বলি সে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত। কেহ অর্থে আসক্ত, কেহ স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত।

মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাই। কেহ সন্তানবিয়োগে পাগল হয়, আত্মহত্যা করে; আবার, কেহ বা পরমেশ্বরের নাম করিয়া শোক জয় করে।

সামান্য অসুবিধা হইলে, কেহ পরমেশ্বরের উপাসনায় বিরত হন। তাহার কারণ, অনুরাগের অভাব। আবার কেহ বা অনেক অসুবিধা ও স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া নিয়মিতরূপে উপাসনা করেন। প্রবল অনুরাগই তাহার কারণ।

লোকে পুত্রশোকে যেমন কাতর হয়, অর্থক্ষতিতেও সেইরূপ। অর্থনাশে মানুষ পাগল হয়, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, জীবনের মায়া অপেক্ষা অর্থের মায়া অধিক।

অনেকের পক্ষে একটী টাকা হারাইলে যত কষ্ট হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির ব্যাঘাৎ হইলে কি, সেইরূপ কষ্ট হয়? একটা টাকা হারাইলে যেরূপ মনের কষ্ট হয়, একবেলা উপাসনা না হইলে অথবা মুখ দিয়া একটা মিথ্যা কথা বাহির হইলে, অনেকের পক্ষে কি, সে পরিমানেও কষ্ট হয়? সাংসারিক পদার্থের প্রতি মায়া অনেকের এতই অধিক!

যশ মান লোকের প্রবল আসক্তির বিষয়। নিন্দা হইলে কি কষ্ট! প্রশংসা হইলে কি সুখ! মানুষের প্রাণ প্রশংসায় নাচিয়া উঠে! নিন্দায় মানুষ মরিয়া যায়! মানুষ কথায় বাঁচে কথায় মরে!

মনের স্বভাব এই যে যাহার প্রতি ভালবাসা, তাহার নিকট যাইতে চায়। সেই জন্য আসক্তি, পার্থিব পদার্থের নিকট মনকে লইয়া যায়। সেই জন্যই মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে। সেই জন্য আসক্তি ব্রহ্মসাধনের ব্যাঘাত করে।

কাহারও কাহারও জীবনে আসক্তি-কাটিয়া গিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। যে কোন কারণেই হউক কাহারও কাহারও জীবনে এইরূপ হইয়া থাকে। আসক্তি তিরোহিত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তখন মনের ভাব এইরূপ হয়;—সকলই অসার, সকলই অনিত্য, সকলই

মরণশীল। কিছুতেই আস্থা থাকেনা। কেহই আপনার নহে। মরিলেই সব ফুরাইল। কে কবে মরিবে, আমি কবে মরিব, কে জানে? সকলই জলবিম্ববৎ স্বপ্নবৎ, মরীচিকাবৎ! সংসারটা যেন একটা মহাশ্মশান! ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

এক প্রকার সাময়িক বৈরাগ্য আছে, তাহাকে শ্মশানবৈরাগ্য বলে। শ্মশানবৈরাগ্য কেমন? বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু শিকড় মাটির নীচে রহিল। সুতরাং বৃক্ষ আবার গজাইয়া উঠিল। সেইরূপ আসক্তির বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল বটে, কিন্তু সংসারের মাটিতে উহার শিকড় থাকিল; সেই জন্য, আবার উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু যদি মূল উৎপাটিত হয়, তাহা হইলে আর সংসারের রস টানিতে পারেনা, মরিয়া যায়।

বৈরাগ্য অনেকের পক্ষে বড় কষ্টের অবস্থা। একদিক্ গিয়াছে, আর একদিক্ আসে নাই। হৃদয় যেন শ্মশান। কিছুতেই মন বসে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "এই অবস্থার লোক বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হয়।"

তৃষ্ণার্ত্ত যেমন জল অন্বেষণ করে, বৈরাগ্য সেইরূপ শান্তি অন্বেষণ করে। শান্তি লাভের জন্য কত চিন্তা করে, কত প্রকার উপায় অবলম্বন করে।

আসক্তি কাটিয়া গেলে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের উপরের অবস্থা প্রেম। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি হইলে, জীব শান্তি পায়। স্থায়ী ভক্তি ও প্রেম সকল দুঃখ দূর করে।

ভগবানের প্রতি যে প্রেম, তাহা সকল সংসারে, সকল জীবে ছড়াইয়া পড়ে। কেননা এ সংসার তাঁহারই সংসার; সকল জীব তাঁহারই।

প্রেমের এমনই নিয়ম যে, প্রেমাস্পদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলিও প্রেমিকের নিকট প্রেমাস্পদ হয়। প্রেমাস্পদের সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহাও প্রেমিকের নিকট প্রেমের বিষয় হয়। সেইজন্য ভগবৎ-প্রেমের অবস্থায় সংসার আবার ফিরিয়া আসে। বৈরাগ্যের অবস্থায় যে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আবার আসিল। শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া পুতুলগুলি ফেলিয়া দিল। মা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন, আবার পুতুলগুলিও তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন। যাহা গিয়াছিল, আবার আসিল। সংসার পর হইয়াছিল, আবার আপনার হইল।

স্ত্রী পুত্র পরিবার, সকল জীব, সকল সংসার, পরমেশ্বরের; আমার মাতাপিতার; সুতরাং সকলই আমার, কেহ পর নহে।

আসক্তি কি বলে? স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন সম্পত্তি, সকলই আমার। বৈরাগ্য কি বলে? কে আমার? কে আপনার? সকলই পর। প্রেম কি বলে? সকলই আমার মাতাপিতার। সুতরাং সকলই আমার; সকলই আমার আপনার। সকলই আমার ভাই ভগিনী।

প্রেমের ফল স্বার্থত্যাগ ও সেবা। যে ব্যক্তি কেবল সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে চায়, সে স্বার্থের দাস। প্রেম কাহাকে বলে, সে জানে না। যাহার জন্য আমার অর্থ, সুখ, আরাম, শরীরের রক্ত না দিতে পারি, তাহার প্রতি কি আমার প্রেম আছে?

স্বর্গীয়া কুমারী কব বলিয়াছেন যে, কত নারী কত পুরুষের প্রেমে পড়িয়া, এবং কত পুরুষ কত নারীকে ভালবাসিয়া তাহার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতে প্রস্তুত;

কিন্তু আমরা সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের জন্য কি করিতে পারি ?

যিনি পরমপুরুষ, সত্য সুন্দর পুরুষ, জগৎপতি, হৃদয়নাথ, তাঁহার জন্য কতটুকু স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে আমরা প্রস্তুত ?

হে হৃদয়নাথ! সত্য সুন্দর পুরুষ! আমার প্রাণেশ্বর! "প্রাণস্য প্রাণঃ", এই দেহ, মন, প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয়, সকলই তোমারই প্রদত্ত। আমার নিজের কি আছে? আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার। আমি আপনি আপনার নই। আমি তোমারই সম্পত্তি। আমি যেমন তোমারই, সেইরূপ, যথার্থই যেন আপনাকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারি। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া, নিরন্তর তোমার প্রেমমুখ দর্শন করি। তোমার মুক্তিপ্রদ সহবাসে যেন আমার শোক, তাপ, পাপ, সকলই বিদূরিত হয়। হে প্রেমময়! তোমার অপরিশোধ্য প্রেমঋণে, ইহজীবন, অনন্তজীবন, যেন চিরবিক্রীত হইয়া থাকে। যেন তোমার প্রেমে বাঁচি, তোমার প্রেমে মরি। যদি এ জীবন বিসর্জ্জন দিলে তোমাকে লাভ করিতে পারি, তবে ত সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে পরমধন লাভ করিলাম। হে প্রাণেশ্বর! জীবনের জীবন! কৃপা কর! চরণে স্থান দেও! এ অধম দাসকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লও।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

মার্কস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

ডেমক্রিটাস্ বলেন;—"যদি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে চাহ, তবে অধিক কাজের ভার হাতে লইও না।" আমার মনে হয়,—এই কথা বলিলে আরও ভাল হইত যে "নিতান্ত আবশ্যক ছাড়া কোন কাজ করিবে না; সামাজিক জীবের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য এবং যে প্রণালীতে কাজ করা কর্ত্তব্য তাহাই করিবে।" কারণ এই নিয়মানুসারে, কাজ অল্প হইলেও, তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সুখ তাহা হইলে আমরা অনুভব করিতে পারি। আমরা যে-সকল কথা কহি, যে সকল কার্য্য করি, তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক; আমাদের কথা ও আমাদের কাজ যদি কমাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের হাতে অনেক অবসর থাকে, মনও বিচলিত হয় না। অতএব কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে আপনি এই প্রশ্নটি করিবে, "এমন কোন জিনিসে হাত দিতেছি কি না, যাহা প্রায় অনাবশ্যক?" আমাদের কি চিন্তা, কি কার্য্য—উভয়ের সম্বন্ধেই এই কথাটি মনে করিবে। কেননা, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা,—অনাবশ্যক কার্য্যকে টানিয়া আনে।

এ দিক্‌টা দেখিয়াছ কি? তবে ও দিক্‌টাও একবার দেখ। মনকে বিচলিত হইতে দিবে না; তোমার মনের যেন একটিমাত্র সংকল্প হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দোষে দোষী হয়, তবে সে আপনারই অনিষ্ট করে,—আপনার নিকটেই দোষী হয়। যদি তোমার কোন সুবিধা কিংবা লাভ হইয়া থাকে,—জানিবে সে বিধাতার দান। বিশ্বজনীন কারণ হইতে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা তোমার অদৃষ্টে গোড়া হইতেই আছে। মোটের উপর জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব ন্যায়পরায়ণ হও, দূরদর্শী হও, জীবনের সদ্ব্যবহার কর, আত্মবিনোদনের সময় সতর্ক থাকিও।

হয় এই জগৎ জ্ঞানময় সংকল্প হইতে, নয় আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন। যদি

আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহা জগৎ—অর্থাৎ সুষমা-বিশিষ্ট একটি সুন্দর গঠন। যদি কোন মানুষ আপনার গঠনে সুষমা দেখিতে পায়,—তবে সে কি বিশ্বজগৎকে বিশৃঙ্খলার রাশি বলিয়া মনে করিবে—সেই বিশ্বজগৎ যাহার অন্তর্গত মহাভূতদিগের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাও ক্রমে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

জগতে কি আছে—না জানা, এবং জগতে কি হয়—না জানা,—প্রায় একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। জগতে কি আছে—যে জানে না, এবং জগতে কি হয়—যে জানে না—উভয়ই জগতের সহিত সমান অপরিচিত। সে একপ্রকার রাষ্ট্রের "পলাতক আসামী" বই আর কিছুই নহে। যে জ্ঞানের চক্ষু বুজিয়া থাকে, সে অন্ধ; যাহার নিজের বাড়ী সুসজ্জিত নহে, যে আর একজনের সাহায্য চাহে,—সে ভিক্ষুক। আপনার মনের মত সব হইতেছে না বলিয়া যে সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করে এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, সে জগতের একপ্রকার দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ; এ কথা সে একবার ভাবিয়া দেখে না,—যে কারণ হইতে তাহার অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে, সেই কারণ হইতেই সে নিজেও উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সমস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের বিশ্ব-আত্মা হইতে যে আপনার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সে একপ্রকার স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত রাষ্ট্রদ্রোহী।

এক জায়গা হইতে আলোচনা আরম্ভ কর; Vespatian এর আমলে জগৎ কিরূপ চলিতেছিল একবার ভাবিয়া দেখ;—দেখিবে এখনও যেমন তখনও তেমনি। কেহ বিবাহ করিতেছে, কেহ বা শিক্ষায় ব্যাপৃত, কেহ বা রোগগ্রস্ত, কাহারও বা মৃত্যু আসন্ন, কেহ বা যুদ্ধ করিতেছে, কেহ বা ভোজন করিতেছে; কেহ বা হল কর্ষণ করিতেছে, কেহ বা কেনা-বেচা করিতেছে; কেহ বিনয়ী, কেহ বা গর্ব্বিত; কেহ বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কেহ বা শঠ; কেহ বা বন্ধুগণের মৃত্যু কামনা করিতেছে, কেহ বা রাজকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী-সভার সভ্য হইতেছে; কেহ প্রেমিক, কেহ বা কৃপণ, কেহ বা প্রদেশের, কেহ বা রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেছে। কিন্তু সে সময়কার সমস্ত ব্যাপার বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, Trajan এর আমলে আইস। এস্থলেও তাই, তাহারাও সব চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখ, অন্য কালে এবং অন্য দেশে তোমার চিন্তাকে লইয়া যাও,—সেখানেও দেখিবে কত লোক কত বিচিত্র কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবশেষে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিশেষত তোমার পরিচিত লোকদিগকে স্মরণ করিয়া দেখ, কত বৃথা কার্য্যে তাহারা ধাবমান হইয়াছে; আত্মার মর্য্যাদা তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, স্বকীয় অন্তঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই—তাহাতেই তাহারা দৃঢ়রূপে আসক্ত হয় নাই।

মনে রাখিও, যে কার্য্যের যতটা ওজন ও গুরুত্ব সেই পরিমাণে তাহাতে ব্যাপৃত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তুচ্ছ বিষয় হইতে বিরত হও, তাহা হইলে বৃথা আমোদ-প্রমোদ অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

যে সকল শব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এখন তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হা! শুধু তাহাই নহে; কালক্রমে যশও ম্লান হইয়া যায়, এবং ভাষার ন্যায় মানুষও

অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। Camillus Coeso Volesus, Leonatus এই সব নাম এখন নিতান্ত "সে-কেলে" হইয়া পড়িয়াছে; Cipio, Cato, Augustus এবং তাহার পর Hadian, Antonius এই সকল নামও শীঘ্র ঐ দশা প্রাপ্ত হইবে। এই সব জিনিস ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্রই স্বপ্ন কথার সামিল হইয়া পড়ে, বিস্মৃতির কবলে পতিত হয়। আমি সেই সকল লোকের কথা বলিতেছি যাঁহারা স্বকীয় যুগের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অবশিষ্ট লোক ত মরিবামাত্রই বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয়। ভাল, চিরস্থায়ী যশের অর্থ কি?—একটা তুচ্ছ অসার বস্তু ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। তবে কোন্ জিনিস আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? মনকে খাঁটি রাখা, সমাজের হিতের জন্য কাজ করা, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সাদরে ও অম্লানবদনে গ্রহণ করা—ইহা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বিষয় আর কিছুই নাই।

তরঙ্গতাড়িত পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হও, তরঙ্গসমূহ পর্ব্বতকে আঘাত করিয়া করিয়া অবশেষে আপনিই উপশান্ত হয়। অমুক ব্যক্তি বলিলেন;—"আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে—আমি কি দুর্ভাগ্য!" মোটেই না! বরং তাহার বলা উচিত,—"এই দুর্ঘটনায় আমি যে বিচলিত হই নাই—বর্ত্তমানে নিষ্পেষিত হই নাই, ও ভবিষ্যতের জন্যও ভীত হই নাই—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার ন্যায় অন্য কাহারও এই দুর্ঘটনা হইতে পারিত; কিন্তু এই দুর্ঘনায়, আমার ন্যায় সকলেই এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় যে দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষা দুর্ঘটনা সহ্য করার সৌভাগ্য কি আমার অধিক নহে? যে ঘটনা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? তুমি যদি ন্যায়বান হইতে চাহ, মহানুভব হইতে চাহ, মিতাচারী ও বিনয়ী হইতে চাহ, বিবেকী, সত্যপরায়ণ, ভক্তিমান ও দাসত্ববিমুখ হইতে চাহ—এই দুর্ঘটনা কি তোমাকে বাধা দিতে পারে? যে ব্যক্তির এই সকল গুণ আছে,—মানব স্বভাবে যাহা থাকা উচিত তাহাই তাহার আছে। কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এই বীজ-মন্ত্রটি স্মরণ করিবে:—এই দুর্ঘটনাটি দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে, বরং ভাল করিয়া সহ্য করিতে পারিলে উহা সৌভাগ্যেই পরিণত হইবে।

মনুর উপদেশ।

আত্মদর্শন।

সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ
সর্ব্বং আত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥

সমাহিত হইয়া, সৎ ও অসৎ-সমস্ত জগৎকে আত্মাতে অবস্থিত দেখিবে। আত্মাতে সমস্ত দর্শন করিয়া, অধর্ম্মে মন দিবে না।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্॥

আত্মাই সমস্ত দেবতা, আত্মাতেই সমস্ত অবস্থিত; আত্মাই এই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ উৎপাদন করিতেছেন।

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াং সমণোরপি
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্॥

সেই পরম পুরুষকে,—সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, উজ্জ্বল প্রকাশবান্, স্বপ্নধীগম্য (চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় উপরত হইলে স্বপ্নাবস্থায় মন-মাত্র অবলম্বন করিয়া যে

জ্ঞান জন্মে তাহাকে 'স্বপ্রধী' বলে) বলিয়া জানিবে।

একমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥

সেই এককে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্ররূপে, কেহ বা প্রাণ রূপে, এবং অপর কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।

এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ
জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥

ইনিই পৃথিব্যাদি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া জন্ম, বৃদ্ধি ক্ষয়ের দ্বারা, এই সংসার-চক্র নিত্য প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥

এইরূপে যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

একটি নূতন আবিষ্কার।

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, জীবের উৎপত্তির উপর বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তির-সম্ভাবনা; মাতৃপিতৃসাহায্য ব্যতীত জীবের জন্ম হইতেই পারে না। আর একদল পণ্ডিত ইহাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বতঃজনন (Spontaneous generation) সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ পুচে (Poucet) সাহেব স্বতঃজননবাদীদিগের নেতা ছিলেন, এবং পরে অধ্যাপক বাষ্টিয়ান্ (Bastion) ইহাঁর সহযোগী হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বলিতেন, জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু ইহাই জীবোৎপত্তির একমাত্র ধারা নয়। অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি আমাদের চারিদিকে নিয়তই চলিতেছে। উদাহরণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহাঁরা গলিত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-করিয়া বলিতেন এগুলিতে যে অতিক্ষুদ্র অসংখ্য কীটের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহাই স্বতঃজননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্টুর (Pasteur) এই স্বতঃজননবাদীদিগের সমগ্র যুক্তিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। গলিত জীবদেহে যে সকল ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়, সেগুলি যে পিতৃমাতৃসাহায্য গ্রহণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করে, পাস্টুর সাহেব এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক টিন্‌ডাল্ সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

ইহার পর বহুকাল স্বতঃজননবাদীদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই। বিরোধী পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় স্বতঃজননের প্রায় সকল ব্যাপারগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আদিম জীব যে স্বতঃজাত নয়,-তাহা ইহাঁরা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কাজেই স্বতঃজনন কথাটা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের এক অংশে থাকিয়া গিয়াছিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বার্ক নামক জনৈক ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে রেডিয়ম্ নামক নবাবিষ্কৃত ধাতুটির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেইসময়ে স্বতঃজননের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া একটা সংবাদ জানা গিয়াছিল। স্বতঃজননবাদের ছিন্ন মূল এই আবিষ্কারে পল্লবিত হইবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু অপর বৈজ্ঞা-

নিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় বার্কের আবিষ্কার অটল থাকিতে পারে নাই। বিচারে ইহার অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছিল।

সম্প্রতি ডুবারন্ (Dubarn) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গের আর একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আবিষ্কারটি কেবল স্বতঃজননেরই পোষক নয়, ইহা পদার্থমাত্রেরই গোড়ার খবর আনিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আবিষ্কারক জৈব অজৈব সকল পদার্থকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক কণাকেই সজীব পদার্থের ন্যায় নড়িতে চড়িতে দেখিয়াছিলেন।

আবিষ্কারক ডুবারন্ সাহেব বিদেশী হইলেও, তিনি কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বাস করিতেছেন, এবং এই কলিকাতায় বসিয়াই তাঁহার আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিতেছেন, তাই আমরা অতি আগ্রহের সহিত আবিষ্কার বিবরণটি লিখিতে বসিয়াছি।

জীববিদ্যা আজকাল যে প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া মনে হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রধান গঠনোপাদান জীবসামগ্রীর (Protoplasm) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য, এবং জীবদেহের কোষগুলির-জন্ম মৃত্যুর রহস্য এক অণুবীক্ষণ-যন্ত্রই চক্ষুতে দিব্য দৃষ্টি যোজনা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতেছে। জীব তত্ত্বের গবেষণায় আজকাল যে সকল অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেগুলিকে নানা প্রকারে সুব্যবস্থিত করা সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যায় নাই। জীবাণু (Bacteria) প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র বস্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে গেলে, নানাপ্রকার রঙ দিয়া সেগুলিকে আজও রঞ্জিত করিতে হয়, নচেৎ পরীক্ষাকালীন তাহারা মোটেই আমাদের চোখে পড়ে না। তা'ছাড়া জীবাণুগুলি যাহাতে নড়িয়া চড়িয়া যন্ত্রের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টিক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা হয়। প্রচলিত অণুবীক্ষণযন্ত্রকে সংস্কৃত করিয়া নূতন প্রথায় একটি উন্নত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য ডুবারন্ সাহেব অনেকদিন অবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। জীবাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবগণের স্বচ্ছন্দ বিহার বন্ধ করিয়া এবং তাহাদের দেহাভ্যন্তরে রঙ প্রবেশ করাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে, তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াই তিনি নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহাঁর চেষ্টা সফল হইয়াছে। সূর্য্যালোককে বা বিদ্যুদালোককে আবশ্যক মত প্রখর করিয়া যন্ত্রে ফেলিবারও একটি সুন্দর কৌশল সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া ইনি অণুবীক্ষণের শক্তিকে বৃদ্ধি করিবারও একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁর স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্রটির শক্তি এত অধিক হইয়াছে, যে ইহাদ্বারা কোন ক্ষুদ্র জিনিস পরীক্ষা করিলে যন্ত্রে তাহার আকার ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণ দীর্ঘপ্রস্থে বড় দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র এপর্য্যন্ত কেবল নামেই অণুবীক্ষণ ছিল। কোন যন্ত্র সাহায্যে অদ্যাপি অণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। ডুবারন্ সাহেব তাঁহার অণুবীক্ষণকে সত্যই অণুবীক্ষণ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

স্বর্ণ রৌপ্য ও প্লাটিনম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে চূর্ণ করিয়া ও পিষিয়া, তাহা-

দেরি ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে লইয়া ডুবারূন্ সাহেব তাঁহার নিজের হাতের অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কণাগুলির প্রকৃত ব্যাসের পরিমাণ এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের একভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু যন্ত্রে সেগুলির প্রত্যেককে এক একটি শিশিরবিন্দুর আকারে দেখা গিয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, ইনি যতগুলি পদার্থের কণা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সকলকেই সম্পূর্ণ গোলাকার এবং একই আয়তনবিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

ইহার পর আরো সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডুবারন্ সাহেব অপর যে সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরো বিস্ময়কর। পরীক্ষায় প্রত্যেক কণাটিকেই তিনি চঞ্চল দেখিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না মানিয়া প্রত্যেকেই সজীব পদার্থের ন্যায় চলা ফেরা আরম্ভ করিয়াছিল। কণাগুলিতে অত্যন্ত তাপ প্রয়োগ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়াও ঐ সজীবতার লক্ষণের পরিবর্ত্তন করা যায় নাই।

দুইটি চলিষ্ণু জিনিস বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিলে, উভয়েরই বেগ কমিয়া আসে। কিন্তু ডুবারন্ সাহেবের আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক বর্ত্তুল কণাগুলি সংঘর্ষণের এই সুপরিচিত নিয়ম মানিয়া চলে নাই। ধাক্কায় তাহাদের প্রত্যেকটির বেগের বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। পদার্থমাত্রেরই সূক্ষ্ম কণার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আবিষ্কারক বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাপ বা আলোক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের উপর পড়িলে চাপ (Radiation Pressure) দিয়া তাহাকে গতিশীল করায়। নানাপ্রকারে তাপালোকের চাপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উহাই অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিতে চঞ্চল করে বলিয়া আবিষ্কারক প্রথমে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কণাগুলিকে অনিয়মিতভাবে যথেচ্ছ চলিতে দেখিয়া, ইহা যে, তাপালোকের চাপের কার্য্য নয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকারে জড়পদার্থের পরিজ্ঞাত সাধারণ ধর্ম্মগুলির মধ্যে কোনটিরই সহিত ঐ সকল জড়কণার কার্য্যের ঐক্য দেখিতে না পাইয়া আবিষ্কারক তাহাদিগকে "সজীবকণা" (Vital particles) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং ধাতু প্রস্তরাদির সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া সকলেরই ঠিক একই কার্য্য দেখা গিয়াছিল, সুতরাং আবিষ্কারকের মতে এই সকল সজীবকণাই সজীব নির্জ্জীব সকল পদার্থেরই গঠনোপাদান এবং শেষ পরিণাম।

আধুনিক জীব তত্ত্ববিদ্‌গণ জীব সামগ্রী (Protoplasm) নামক এক জিনিসকে জীবদেহের প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। নির্জ্জীব অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্রিত হইয়া পড়িলে তখন তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং পূর্ব্বেকার নির্জ্জীব পদার্থ সজীবের সকল ধর্ম্ম পাইয়া জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যগুলি দেখাইতে থাকে। ইহাই জীব-সামগ্রী। অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি জীবসামগ্রীকে নিজের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। বিধাতার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শিল্পশালাই ইহার উৎপত্তি, এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় নির্জ্জীব পদার্থ জীবধর্ম্মী হয়, তাহা বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত আর কেহই জানেন না। ডুবারন্ সাহেব তাঁহার "সজীবকণার" সাক্ষাৎ পাইয়া বলি-

তেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বলেন, তাহা সজীবকণারই সমষ্টি এবং কণাগুলিই জীবসামগ্রীতে সজীবতা আনয়ন করে; অর্থাৎ "সজীবকণা" জীবসামগ্রীর এক ধাপ নীচেকার জিনিস।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সজীব নির্জীব নানা পদার্থের সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া ডুবার্‌ন্ সাহেব যে সজীবতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাপ দিয়া আঘাত দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তিনি সেগুলির জীবধর্ম্মের লোপ করিতে পারেন নাই, এবং সেগুলিকে কোন ক্রমে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেই বাধ্য করা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই যখন ঐ "সজীবকণা" দ্বারা গঠিত তখন একত্রিত হইলেই তাহারা কেন প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলে। আবিষ্কারক এই প্রশ্নটির পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নাই। তবে "সজীব কণা" পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িলেই যে তাহাদের সজীবতা লোপ পাইয়া যায়, এবং বিযুক্ত হইলেই যে আবার তাহার পুনর্বিকাশ হয়, পরীক্ষায় তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া ডুবার্‌ন্ সাহেব বলিতেছেন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই যেসকল উপাদানে গঠিত তাহা মূলে সজীব। "সজীবকণা" সকল পুঞ্জীভূত হইয়া যখন তাহাদের মূল-গত জীবধর্ম্মকে অপ্রকাশ রাখিয়া দেয়, তখনি সেই সকল "জীবকণার" সমষ্টি আমাদের নিকট নির্জীব পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, এবং পুঞ্জীভূত হওয়ার পরও সে গুলি যখন তাহাদের স্বাভাবিক সজীবতাকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই কণাসমষ্টি আমাদের নিকট সজীব হইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা যে সজীব ও নির্জীবের ভেদ স্বীকার করিয়া আসিতেছি, তাহা ডুবার্‌ন্ সাহেবের মতে মূলগত ভেদ নয়। জীবনের প্রারম্ভ ও শেষ নাই। সমস্ত পদার্থই ভগবানের ইচ্ছায় সজীব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই আদিম জীবের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে স্বতঃজনন বলিয়াছেন, তাহা প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছায় নিয়তই আমাদের সম্মুখে চলিতেছে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ডুবার্‌ন্ সাহেব সজীব কণাগুলির আকার সম্পূর্ণ গোল দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কার্য্যবিধিপরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে শূন্যগর্ভ অনুমান করিতেছেন। শূন্যগর্ভ জিনিসের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ও তাহার কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া যদি জলে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ভিতরকার জল যেমন সবলে ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইতে থাকে তেমনি ভিতরকার জলের চাপ সমগ্র জিনিসটাকে ঠেলিয়া বিপরীত দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমরা প্রতিদিনই নানাপ্রকারে তরল পদার্থের চাপের এই কার্য্যটিকে দেখিতে পাই। ডুবার্‌ন্ সাহেব "সজীবকণার" সঞ্চলন ব্যাপারটাকে চাপের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ইহাঁর মতে, "সজীবকণা"-গুলি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার জিনিস হইলেও, প্রত্যেকের কোষ-প্রাচীরে অন্ততঃ দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। জল বা অপর কোন তরল পদার্থে ভাসিতে আরম্ভ করিলেই, ইহারা আপনা হইতেই এক ছিদ্র দ্বারা জল উদরস্থ করিয়া অপর ছিদ্রপথে তাহা বাহির করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইহাতে কোষস্থ জলের চাপের একতা নষ্ট হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে

সঙ্গে কণাগুলিও বিচিত্রগতিসম্পন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

"সজীবকণা"-গুলিকে শূন্যগর্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়া ডুবারন্ সাহেব কতকগুলি রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সমস্যারও সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লৌহ ও গন্ধক এই দুই মূল পদার্থের এক এক পরমাণু একত্রিত হইলে একটি যৌগিক পদার্থের (Iron Sulphide) উৎপত্তি হয়। লৌহ এবং গন্ধক এই দুইয়ের কোন ধর্ম্মই পদার্থটিতে দেখা যায় না। ডুবারন্ সাহেব বলেন, লৌহের "সজীবকণা" সকল যখন গন্ধকের "সজীবকণা" গুলিকে উদরস্থ করিয়া আর এক জাতীয় "সজীব কণার" উৎপত্তি করে, কেবল তখনি লৌহ ও গন্ধকের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে। তিন চারিটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইলেও ঠিক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মৌলিক "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক একটি পৃথক "সজীবকণা"র উৎপত্তি করে। লৌহ ও গন্ধকের রাসয়ানিক মিলনে, লৌহের কণা গন্ধকের কণার ভিতর প্রবেশ করে, কি গন্ধকের সজীব কোষ লৌহকোষের ভিতর আশ্রয়লয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ডুবারন্ সাহেব বলিয়াছেন, যে পর্য্যায়ে "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক রাসায়নিক রহস্যেরও প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

ডুবারন্ সাহেবের এই আবিষ্কারের বিবরণ আজও বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বাংশে প্রচারিত হয় নাই। পরীক্ষায় দৃষ্ট ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষ হইলেই যে ভ্রমপ্রমাদহীন হইবে, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং একক ডুবারন্ সাহেব একটিমাত্র যন্ত্রে "সজীবকণা"র সন্ধান পাইয়া যে প্রকাণ্ড সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহার ভিত্তি খুবই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি "সজীবকণা" নামে আখ্যাত করিয়াছেন, তাহারা যে প্রকৃতই সজীব তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই ইনি যে সকল কঠিন কঠিন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন বোধ হয় তাহার আলোচনা করিবার আজও সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন সেই শুভ কাল উপস্থিত হয়, তবে ডুবারন্ সাহেব ধন্য হইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞান কুহেলিকা হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আপাততঃ সিদ্ধান্তগুলিকে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

সমস্ত জিনিসই যে সজীব এই কথাটা শুনিলে এখন আর আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। আমাদের অতি প্রাচীন পিতামহগণ এই ভারতবর্ষে বসিয়াই প্রকারান্তরে এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তারপর আমাদের স্বদেশবাসী মহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সত্যকে দেখাইয়াছেন। ডুবারন্ সাহেব প্রকারান্তরে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বসু মহাশয়ের প্রত্যেক উক্তিই যেমন শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ডুবারন্ সাহেবের কোন কথারই মূলে সে প্রকার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্বদেশী বিদেশী দার্শনিকগণও বহুকাল হইতে মূল জড়কণাকে সজীব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত লিব্-

নিজ্ (Leibnitz) সাহেব আরও উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তিনি পরমাণুকে সজীব বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াও তাঁহার মনে হইয়াছিল। *

অসীমের সহিত সুর বাঁধা

শান্তি, ক্ষমতা, ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা।

প্রস্তাবনা।

মঙ্গলবাদী ঠিক কথা বলেন। অমঙ্গলবাদী ঠিক কথা বলেন। একের সহিত অপরের, আলোক এবং অন্ধকারের মত প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই ঠিক কথা বলেন। ইনি একভাবে দেখেন, উনি আর একভাবে দেখেন; যিনি যে ভাবে দেখেন তিনি তদনুসারে ঠিক কথা বলেন; এই দেখিবার ভাবের দ্বারাই প্রত্যেকের জীবন নিরূপিত হয়; দেখিবার ভাবই জীবনে ক্ষমতা, শান্তি, সফলতা আনয়ন করে; দেখিবার ভাবেতেই জীবন অক্ষম, কষ্টকর, ও বিফল মনোরথ হইয়া যায়।

মঙ্গলবাদী (optimist) দ্রষ্টব্য বিষয়গুলিকে সমগ্রভাবে দেখিতে, এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যথার্থরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। অমঙ্গলবাদী (pessimist) একদেশ দর্শী, এবং তাহার দৃষ্টিপথ সঙ্কীর্ণ। একের বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানালোকিত, অপরের বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন। প্রত্যেকে নিজের অন্তর হইতে নিজের জগৎ নির্ম্মাণ করেন, প্রত্যেকের দেখিবার ভাবের দ্বারা নিজ নিজ নির্ম্মাণক্রিয়া নিরূপিত হয়। মঙ্গলবাদী তাঁর উচ্চতর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজের স্বর্গ রচনা করেন, এবং নিজের স্বর্গ-রচনার সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের স্বর্গ—রচনার সহায়তা করিতে থাকেন। অমঙ্গলবাদী, তাঁহার সঙ্কীর্ণতা বশতঃ, নিজের নরক রচনা করেন, এবং নিজের নরক-রচনার সঙ্গে সঙ্গে অপর অনেকের নরক-রচনার সহায়তা করিতে থাকেন।

তোমার আমার, আমাদের সকলেরই স্বভাবেতে, হয় মঙ্গলবাদীর প্রকৃতির, নতুবা অমঙ্গলবাদীর প্রকৃতির প্রাধান্য রহিয়াছে। সেই হেতু আমরা প্রতি ঘণ্টায় হয় নিজেদের স্বর্গ রচনা করিতেছি, নতুবা নিজেদের নরক রচনা করিতেছি। আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে নিজের স্বর্গ বা নরক রচনা করিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে অপর সকলের স্বর্গ বা নরক রচনার সহায়তা করিতেছেন।

স্বর্গ ঐকতান-সুখরাজ্য। নরক যাতনাময় কারাগার। ঐকতান-সুখরাজ্যে বাস করিতে হইলে সকল লোক, সকল পদার্থের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; যথাযথ সম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটিলে ঐকতান বিলুপ্ত হইয়া যায়। সকলের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে না পারিলে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়, এই পার্থক্য নরকের যাতনাময় কারাগার নির্ম্মাণ করে।

বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ সত্য।

বিশ্বের কেন্দ্র স্বরূপ মহান সত্য এই যে, সেই এক অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মা সকলের আদি কারণ, তাহা হইতে সকল প্রাণী প্রাণবন্ত হইতেছে, তাহাই সকলের অন্তরে এবং সকলের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে; জীবনের সেই স্বয়ম্ভু মূলতত্ত্ব হইতে সকলই আসিয়াছে, এবং অবিরাম আসিতেছে। যদি খণ্ড জীবন থাকে, তাহা হইলে জীবনের অখণ্ড অসীম আকর থাকিবেই থাকিবে; জীবনের সেই অখণ্ড অসীম আকর হইতেই খণ্ড জীবন আসিতেছে। যদি একটি প্রেমগুণ বা শক্তি থাকে, তাহা হইলে প্রেমের অসীম আকর থাকিবেই থাকিবে; প্রেমের সেই অসীম আকর হইতেই সকল প্রেম আসিতেছে। যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পূর্ণজ্ঞানের আকর থাকিবেই থাকিবে; পূর্ণজ্ঞান হইতেই আংশিক জ্ঞান আসিতেছে। শান্তির

---

* ডুবারন্ সাহেবের গবেষণার বিশেষ বিবরণ "Indian Research Society"র ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত পত্রের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিষয়টির বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে, ক্ষমতার সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে, আমরা যাহাকে বলি জড়পদার্থ তৎসমুদয় সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, এক অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মা সকলের আদি কারণ এবং সকলের আকর ভূমি। সেই অসীম ক্ষমতা, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও শক্তি সমূহ দ্বারা, সৃজন করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, শাসন করিতেছে; এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও শক্তিসমূহ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া প্রধাবিত হইতেছে, আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমাদের দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কাজ এই সমস্ত নিয়ম ও শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। পথ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত প্রত্যেক বনফুল, কোন এক মহান অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শাসনে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, প্রস্ফুটিত, বিশুষ্ক হইতেছে। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ক্রীড়াশীল প্রত্যেক তুষার কণিকা, কোন না কোন মহান অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শাসনে গঠিত, পতিত, দ্রবীভূত হইতেছে।

এমনও বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিপুল বিশ্বে নিয়ম ভিন্ন কিছুই নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে, এমন একজন নিয়ন্তা অবশ্যই থাকিবেন যিনি সমস্ত নিয়মের স্রষ্টা, এবং যাঁহার শক্তি এইসমস্ত নিয়ম অপেক্ষাও প্রবলতর। সেই অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মাকে আমি ঈশ্বর বলি। তুমি তাঁহাকে করুণাময়, জ্যোতির্ম্ময়, বিধাতা, পরমাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান, কিম্বা তোমার সুবিধামত আর যাহা কিছু ইচ্ছা বলিতে পার, তাহাতে আমার কিছু আসে-যায়না। কেন্দ্রস্বরূপ মহান সত্যটী সম্বন্ধে যদি তুমি আমি একমত হই তাহা হইলে, তুমি যে নাম ইচ্ছা বলনা কেন তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

অতএব, দেখা যাইতেছে, যিনি নিজের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে এবং যাঁহাতে সকলই স্থিতি করিতেছে, যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই, সেই অসীম আত্মাই ঈশ্বর। ফলতঃ এবং সত্য সত্যই তাঁহাতে আমরা জীবন ধারণ করি, তাঁহাতে বিচরণ করি, তিনিই আমাদের জীবন। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের প্রাণস্বরূপ। আমরা তাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়াছি এবং অবিরাম পাইতেছি। আমরা ঐশ্বরিক প্রাণের অংশভোগী; তাঁহার সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমাদের আত্মা খণ্ড আত্মা, তিনি অসীম আত্মা, ঐশ্বরিক জীবন এবং মানুষিক জীবনে উপাদানগত কোন পার্থক্য নাই, বস্তুতঃ একই। পার্থক্য উপাদানে বা গুণে নহে, পার্থক্য পরিমাণে।

এমন অনেক দিব্যজ্ঞানী মহাত্মা ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, আমরা আমাদের জীবন, দৈবপ্রবাহের ন্যায়, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। আবার, এমন অনেক লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের জীবন আর ঈশ্বরের জীবন একই, মানুষেতে ঈশ্বরেতে ভেদ নাই। এই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী—কাহার মত ঠিক? উভয়েরই মত ঠিক; যথার্থরূপে বুঝিলে দুই মতই ঠিক।

প্রথম মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই; যদি বল যে, ঈশ্বর সকল জীবনের আদি অসীম আত্মা, আর তাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে, তাহা হইলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, আমাদের খণ্ড আত্মা সকল সেই অসীম আকর হইতে, দৈবপ্রবাহের ন্যায়, অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই; আমাদের জীবনের খণ্ড আত্মা সকল যদি সেই অসীম আত্মা হইতে অব্যবহিতরূপে প্রবাহিত হয়, এবং তাঁহারই অংশ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই অসীম আত্মার যতখানি প্রকাশ দেখা যায়, তাহা সেই মূল আধারের সহিত অভিন্ন তো হইবেই, যেমন সমুদ্র হইতে গৃহীত বারিবিন্দু, প্রকৃতিতে ও গুণেতে, তাহার আকরভূমি সমুদ্রের সহিত অভিন্ন। ইহার

ব্যতিক্রম ঘটিবেই বা কিরূপে? শেষোক্ত মতটিতে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে; যদিও মানবিক জীবন এবং ঐশ্বরিক জীবন স্বরূপতঃ একই, কিন্তু এই সত্যটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবিক জীবন খণ্ড জীবন, ঐশ্বরিক জীবন অসীম জীবন এবং সেই অসীম জীবনেতে খণ্ড খণ্ড জীবন সকল ও আর যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই স্থিতি করিতেছে। এমনও বলা যাইতে পারে, জীবনের স্বরূপের দিক হইতে দেখিলে দুই জীবন একই; জীবনের পরিমাণের দিক হইতে দেখিলে দুই জীবনে বিশাল ভিন্নতা।

এইরূপ ভাবে দেখিলে, ইহা কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে দুই পক্ষের ধারণাই ঠিক, দুই মত একই? এই দুই বিশ্বাসই এক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত হইতে পারে।

এক উপত্যকা দেশে একটি জলাধার আছে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এক অক্ষয় জলাধার হইতে জল আসিয়া উপত্যকার জলাধারটীকে পূর্ণ করে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বৃহত্তর জলাধারের প্রবাহ হইতেই উপত্যকার জলাধার জল প্রাপ্ত হয়। ইহাও বলিতে হইবে যে, উপত্যকার জলাধারের জল, প্রকৃতিতে গুণেতে ও ব্যবহারেতে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বৃহত্তর জলধারের জলের সহিত ঠিক সমান। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পর্ব্বত পার্শ্বস্থ জলধারের জলের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহার দ্বারা উপত্যকার জলধারের ন্যায় সহস্র জলাধার পরিপূরিত হইয়াও তাহার জলের পরিমাণ অক্ষয় থাকে।

মানুষের জীবনেও তদ্রূপ। আমাদের মধ্যে আর যে কোন বিষয়ে যত কিছু মত ভেদ থাকুক না কেন, কিন্তু এই বিষয়ে, বোধ করি, আমরা সকলেই একমত হইতে পারি যে, এক অসীম জীবন আত্মা সকলের আদি কারণ, সকলের জীবন, অতএব তাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে তোমার আমার প্রত্যেকের জীবন, দৈব প্রবাহের ন্যায়, সেই অসীম আধার হইতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, মানুষেতে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে সে জীবন অসীম আত্মার সহিত স্বরূপতঃ অবশ্য একই হইবে। এক প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ স্বরূপেতে নহে, সে প্রভেদ পরিমাণে।

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মানুষ যে পরিমাণে দৈব প্রবাহের পথে, নিজেকে উন্মুক্ত রাখেন সেই পরিমাণে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েন। অতএব, ইহাও নিশ্চিত যে, যে পরিমাণে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েন সেই পরিমাণে তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা জন্মিতে থাকে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা যদি অসীম হয়, তাহাহইলে ইহা কি সত্য নহে যে, মানুষ নিজেকে নিজে সীমাবদ্ধ না করিলে মানুষ অনন্ত উন্নতির অধিকারী, মানুষ নিজেকে নিজে না জানার দরুণই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে?

(In tune with the Infinite). Trine

মুরাবাদী শৈলশিখরস্থ গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে প্রার্থনা।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর, আমাদের কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয় তা' তুমিই জান। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমরা কার্য্যের দূর-ফলাফল কিছুই বুঝিতে পারি না; যাহা আমরা ভাল মনে করি, হয়-ত তাহাই আমাদের পক্ষে মন্দ; আর যাহা মন্দ মনে করি, হয়-ত তাহাই আমাদের পক্ষে ভাল। তোমার ইচ্ছার গূঢ় রহস্য আমরা কি বুঝিব? তোমার ইচ্ছায় সমৃদ্ধ নগরও শ্মশানে পরিণত হইতেছে; আবার তোমার ইচ্ছাতেই শুষ্ক মরুভূমির উপর, ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়ী ইন্দ্রপুরী নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা এই মাত্র জানি, তুমি মঙ্গলময়; তোমার যা ইচ্ছা তা' মঙ্গল-ইচ্ছা; শিশু জন্মিবার পূর্ব্বেই তুমি মাতার হৃদয়ে স্নেহ-নীর সঞ্চারিত কর, তুমি জীবের আহারের জন্য